সত্য সনাতন ধর্ম্ম।

প্রশ্নোত্তরে সত্য সনাতন ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

"সত্যাদ্ উৎপদ্যতে ধর্ম্মো দয়া দানং প্রবর্ত্ততে।
ক্ষমায়াং স্থাপিতো ধর্ম্মো লোভ মোহদ্বিনশ্যতি॥"

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়—

শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩২০ সাল।

এস. মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত,
১৯৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশকের মন্তব্য ।
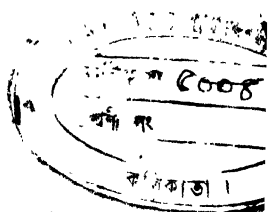
বন্দে চৈতন্য দেবং ত্বং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া ।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রঃ লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥

যাঁহার ইচ্ছায় এই ব্যক্তিও লিখন কার্য্যরূপ রঙ্গভূমিতে উৎসাহের সহিত আশ্চর্য্যরূপে নৃত্য করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা করি ।

আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা যে কিছু লিখিত হওয়া, তাহা কেবল শ্রীগুরুর মহিমাই প্রকাশ, অপর কিছুই নহে। মহানুভবগণ এই লিখাতে—ভাষার দোষ গুণের দিকে না তাকাইয়া কেবল বোবার মুখের হরিবোল শুনিয়া গুরুমহিমা দর্শণে আনন্দিত হইবেন এই ভরসা।

সত্য সনাতন ধর্ম্ম বিবরণ লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। যে অল্প কিছু বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে, ইহা আমার নিজের তৈয়ারী কিছু নহে। সজ্জন সমাজে যাহা দেখি—শুনি তাহার কতকই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের জন্য ইহা লিখিত হয় নাই। সজ্জনগণ সত্য কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়াই নিত্য নবরস ভোগ করিয়া থাকেন, ইহা সৎসঙ্গেই অবগত হইয়াছি, তাই তাঁহাদের কথা তাঁহারাই শুনিয়া সুখি হইবেন, এই ভরসায়ই ইহা লিখি।

আর শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে প্রকাশ আছে :—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন ! আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই আমার ভজনায় রত হয়।

যাহারা ভবরোগে আর্ত্ত অর্থাৎ যাহারা ভবরোগে পীড়িত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ভব-রোগ-বৈদ্য সদগুরু আশ্রয় প্রার্থী ;—

যাহারা পরমার্থ পিপাসায় অর্থার্থী অর্থাৎ যাহারা পরমার্থ ধনের কাঙ্গাল হইয়া ধনী মহাজন অন্বেষনে রত ;—

যাহারা সত্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসু অর্থাৎ যাহারা সত্যানুসন্ধানে তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল ;—

এবং যাহারা "মায়াময় সকলি অসার" জ্ঞানে জ্ঞানী অর্থাৎ মায়াময় সংসার হইতে নিজ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি পর্য্যন্ত সকলি মিথ্যা জ্ঞান জানিয়া যাহারা "হায় হায় কে আমি, কাহার প্রেরিত হইয়া কি কার্য্যে এথায় আসিয়াছি, এই সত্য অনুসন্ধান করিতে করিতে অনুপায় হইয়া প্রাণে প্রাণে এই মর্ম্ম গাহিতেছেন যে ঃ—

গীত।

কে সাজালে অন্ধ, একি কপাল মন্দ,
নাহি সে সম্বন্ধ কে আমি কাহার ॥
ইকি দুর্ঘটন, ভুলেছি স্মরণ,
কেবা পাঠাইলে কি কাজে তাঁহার ॥
আমি আমার ভাবে, কত রঙ্গে ভাসি,
মিছে সুখ, সুখে কত হাসি খুসী—
এ সুখে কিসুখ, প্রাণে মসী রাশী,
আছি শুষ্ক প্রাণে যেন অনাহার ॥
কার অন্বেষণে, ঘুরি দিবারাতি ;

কি ভাব অভাবে নিভেছে সে বাতি—
কে আছ এমন, দয়াল মূরতি,
প্রকাশিয়ে জ্যোতি ঘুচাও হে আঁধার ॥

এই সকল ভাবাপন্ন সুকৃতি-জন-গণ সমীপে যদি কোন ক্রমে এই সত্য সনাতন ধর্ম্ম বিবরণ উপস্থিত হইয়া কোন প্রকার উপকার সাধন করে তবেই এই লিখা সার্থক।

যাঁহার কথা ইহাতে লিখিত, তিনিই জানেন, তাঁহার কি ইচ্ছায় এই কার্য করাইয়া লইয়াছেন। আমার ইহাতে কোন প্রকার বাসনা নাই। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক এই মাত্র অন্তরের কথা।

সন ১৩১৯ বাং,
মাঘ।

সজ্জন সেবাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস।
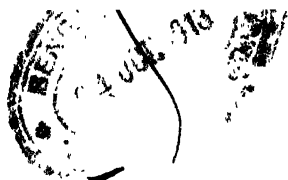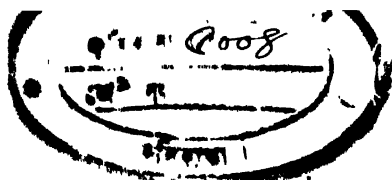
সত্য সনাতন ধৰ্ম্ম।

প্রশ্নোত্তরে—সত্য সনাতন ধর্ম্মের—সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বাহ্য বিষয়।

ধর্ম্মের নাম

প্রশ্ন = আপনারা যে—সনাতন ধৰ্ম্ম বলেন, এই ধৰ্ম্ম কি ছয় গোস্বামীর মধ্যে যে সনাতন গোস্বামী ছিলেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নাকি ?

উত্তর = না, না তা নয়। সনাতন শব্দের অর্থ শাশ্বত, নিত্য, প্রাচীন। যে সত্য ধৰ্ম্ম—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারি যুগেই প্রচলিত—তাহাই সনাতন ধৰ্ম্ম। সনাতন গোস্বামীত সেদিনকার লোক। বিশেষতঃ ইনি মহাজন সংখ্যার কোন একজনও নন। অনাদি কাল হইতে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নামধারী মহাজনগণ জগতে উদিত হইয়া এ সত্য জগতে প্রচার করিয়া জগতকে ধন্য করিয়াছেন ও করিতে-ছেন। এই ধৰ্ম্মে প্রবিষ্ট জনগণের মৰ্ম্মগত ইহার আর এক অর্থ আছে, তাহা এই স্থলে বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইহা কেবল বাহ্যভাবের প্রশ্নোত্তর হইতেছে, মৰ্ম্মী না হইলে সেই মৰ্ম্মার্থ কেহ

বুঝিবেন না। গুরু কৃপায় যাঁহারা আত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের গুরুদত্ত চক্ষু ফুটিয়াছে, যাঁহারা গুরুবীর্য্যে অর্থাৎ সদ্‌গুরুমুখে হরিনাম শুনিয়া ঐ নামের শক্তিতে দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করতঃ স্বধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা সম্যকরূপে অবগত আছেন। তবে সত্য কথার এতই মাহাত্ম্য যে, মর্ম্ম অবগত না থাকিয়াও যদি কেহ শ্রদ্ধা সহকারে কাণ দিয়া শুনে, তাহা হইলে প্রাণে প্রাণে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়াই পারে না। তাই যে যতদূর বুঝিবার বুঝিবেন ভাবিয়া ইহাও জানাইতেছি যে, ইঁহারা সনাতন ধর্ম্মও বলেন—শুনাতন ধর্ম্মও বলেন। সনাতন কি তা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন শুনাতন ধর্ম্ম বলেন কেন, তাহা একটু শুনুন। বর্ত্তমান ধনী মহাজনের জ্যোতির্ম্ময় বাক্য শ্রবণে যে সত্য, নিত্য, আনন্দময় তনু লাভ হয়, সেই তনুতে যে ধর্ম্ম—তাহাই শুনাতন ধর্ম্ম।

প্রশ্ন = আচ্ছা, অপর লোক এই ধর্ম্মের নানা নাম বলে কেন? কোন স্থানে কেহ বলে—সদানন্দি ধর্ম্ম, কেহ বলে—হাসি কান্না ধর্ম্ম, কোন স্থানে কেহ বলে—গুরুভজা বা কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম, কোন স্থানে বলে—ন্যাস-ধর্ম্ম, কেহ কোন স্থানে বলে—একমুনি ধর্ম্ম। কোন স্থানে আপনাদের কারো কারো বাসগ্রামের নাম বা ব্যক্তির নাম দিয়া ধর্ম্মের পরিচয় দেয়, ইহার কারণ কি? আপনারা তাহাতেও কোন আপত্য করেন না কেন?

উত্তর = এই ধর্ম্ম লৌকিক নহে। লৌকিক কোন নির্দ্দিষ্ট নামদ্বারা জগতে পরিচিত হইতে ইঁহারা ইচ্ছা করেন না। তাহাতেই

ইঁহারা নিজে প্রায় কোন নামই বলেন না; কেহ নাম লইয়া বেশী পীড়াপীড়ি করিলে সময় সময় সত্য সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই নামে বা কোন নামে জগতে পরিচিত হইতে ইঁহাদের ইচ্ছা নাই। অপর ব্যক্তিরা যে যাহা বলিয়া ধর্ম্মের পরিচয় দেয়, তাঁহারা ইহার কিছুতেই অসন্তুষ্ট নন্। কারণ যাহাদের অন্তর্চক্ষু ফুটে নাই, তাহারা ইহার পরিচয় কখনও দিতে পারিবে না; তবে বহির্দৃষ্টিতে যে যাহা দেখে তাহাই বলে, তাহাতে আপত্যের বিষয় ইঁহাদের কিছুই নাই। বিশেষতঃ বাক্-দেবী পরম পরাৎপর সতের দাসী। ইনি সাধারণের অজ্ঞাতে সকলের কণ্ঠে বসিয়া সতের মহিমাই কীর্ত্তন করেন, সুতরাং এসব নামেতেও সত্যের মহিমাই প্রকাশ পায়, ইহাও সজ্জনের আনন্দেরই বিষয়।

প্রশ্ন = বহির্দৃষ্টিতে যে যাহা দেখে তাহাই বলে কি রকম?

উত্তর = বুঝিতে পারিলেন না? এই যে নানা নামের কথা বলিলেন, এক একটী করিয়া সব বলিতেছি শুনুন;—বলিয়াছেন, কেহ বলে সদানন্দি ধর্ম্ম, ইহার কারণ এই যে, কোন স্থানে এসব সজ্জনের একত্র সমাগম হইলে, ইঁহাদের আনন্দ উচ্ছাসে অন্তর বাহির প্লাবিত হয়, অন্তরদৃষ্টি যাহাদের নাই, বহির্দৃষ্টিতে এই আনন্দ-উচ্ছাস দেখিতে শুনিতে পায়। বহির্দৃষ্টিতেও সদা এই আনন্দময় ভাব দেখিয়া সদানন্দি ধর্ম্ম বলে। তার পর হাসি কান্না ধর্ম্ম;—এইরূপে ইহাদের যেমন হাসি দেখে, তেমন কান্নার রোলও বাহিরে থাকিয়া দেখিতে পায়, তাই হাসি কান্না ধর্ম্ম

বলে। এর পর গুরু-ভজা বা কর্ত্তা-ভজা ধর্ম্ম;—অন্তচর্ক্ষু বিহীন জন যদিও গুরু বা কর্ত্তা কে তাহা কিছুই জানে না, তথাপি এই সব সজ্জনের মুখে সময় সময় নানা প্রসঙ্গ শুনিয়া ও সময় সময় কার্য্যতঃ নানা ভাব দেখিয়া গুরু বা কর্ত্তাই ইঁহাদের ভজনীয় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে; তাহাতেই গুরুভজা বা কর্ত্তা-ভজা ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। আর ন্যাস-ধর্ম্ম;—এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তের সাধন অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস যোগে সাধন প্রণালী আছে। প্রয়োজনাধীন কেহ কেহ কোন সময়ে সাধন করিয়া থাকেন, ইহার ও বাহ্যদৃশ্য বাহিরে থাকিয়া অনেকেই দেখিয়া থাকেন। শ্বাস প্রশ্বাস যোগে সাধনকে অনেকে ন্যাস বুঝেন, তাই এই দৃশ্য দেখিয়া ন্যাস-ধর্ম্ম বলেন। কেহ কেহ বলেন—একমুনি ধর্ম্ম, ইহার কারণ এই যে, ইঁহাদের কাছে কেহ ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন করিলে সকলেই এক কথা, এক ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ ইঁহাদের মুখে লোকে শুনিয়া থাকে যে, একমন ব্যতীত ধনী মহাজন ধন বিক্রি করেন না, ইঁহারা কহিয়া থাকেন যে—"মন ভেঙ্গে নাই বিকি কিনি, গোলদার ফড়ের মতন"। বাহিরে থাকিয়াও ইঁহাদের কার্য্যে—ব্যবহারে মনের একাগ্রতার ভাব দেখিতে পান। এসব দেখিয়া শুনিয়াই কেহ কেহ একমুনি ধর্ম্ম বলে। আর গ্রামের নাম করিয়া বা ব্যক্তির নাম করিয়া ধর্ম্মের নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই ধর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণে প্রচারিত নহে, কারণ অন্তরঙ্গ ভক্ত সহ প্রভুর পরম রসের খেলা, ও সত্যানুসন্ধিৎসু বদ্ধ জীবগণকে যথোপযুক্ত কৃপা দ্বারা ঐ পরম রসে

মিলিত করাই—এই ধৰ্ম্ম। বহির্ম্মুখ জীবের বহুকাল মায়াময় অনিত্য রসে, সুখ দুঃখে হাবু ডুবু খাইতে খাইতে, জন্ম জন্মান্তরিত বহু সুকৃতি ফলে যখন সত্যের পিপাসা অন্তরে জাগে, তখনই এই অন্তরঙ্গ লাভের সৌভাগ্য উদয় হয়। সৌভাগ্যে এই পিপাসার উদ্রেক হইলে অনুপায় হইয়া এই সৎসঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বা গ্রাম অথবা নিত্যমুক্ত নিত্যসঙ্গী সজ্জন বা ঐ সজ্জনের জন্মস্থান জগতে অধিক নহে। "কোটীতে গুটী মিলে না" পূৰ্ব্বকালেও মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন। এত কলিকাল, কোন কালেই সৰ্ব্ব সাধারণে ইহা প্রচারিত নহে। তাহাতেই বহু গ্রামের মধ্যে কোন গ্রামে ইহার উদয় দেখিয়া সেই গ্রামের নাম উল্লেখে ধৰ্ম্মের নাম করে। বহুলোক মধ্যে কোন ব্যক্তিতে ইহার উদয় দেখিয়া সেই ব্যক্তির উল্লেখে ধৰ্ম্মের নাম করিয়া থাকে। বাহ্য দৃষ্টিতে যে যাহা দেখে তাই বলে।

প্রশ্ন=আর যে কি বলিলেন—বাগ্দেবী সত্যের মহিমা কীৰ্ত্তন করেন—সে কি রকম ?

উত্তর=এই যে নানা নাম বলে—বলিলেন, এই সব নাম দ্বারাও সত্যধৰ্ম্মের মহিমাই বর্ণন হইতেছে। ইহার মৰ্ম্ম না জানিয়াও লোকে এক একটী নাম করিতেছে। বাক্‌দেবীর শক্তিতেই বাক্য প্রকাশ, বাক্‌দেবীরই বাক্য, তাই বলিয়াছি। অজ্ঞাতে বাক্‌দেবী এ সব নামের বাক্য প্রকাশে সত্যের মহিমাই প্রকাশ করিতেছেন। সে মহিমা কি তাহাও কিছু শুনুন। সকলে ঠিক

অবধারণ করিতে পারিবেন কি—না, বলিতে পারি না। ধরুন—সদানন্দি ধৰ্ম্ম। সদানন্দ শিবের নাম। জগৎগুরু যিনি, তিনিই শিব। শিবই জীবকে শিব করেন অর্থাৎ মুক্তাত্মাই বদ্ধ-জীবকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করেন।

"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ। পাশমুক্ত সদা শিবঃ ॥"

সদাশিবই সদানন্দ। সদানন্দি ধৰ্ম্ম বলিতে মুক্তাত্মা—জগৎগুরু সদাশিব সদানন্দের ধৰ্ম্মই বুঝায়। বাস্তবিকই ইহা মুক্তাত্মার ধৰ্ম্ম; বদ্ধজীবের ইহা বোধগম্য নহে। দেখুনত বাক্‌দেবী সদানন্দি বাক্যটী দ্বারা কি মহিমা বর্ণন করিয়াছেন!

আর হাসিকান্না ধৰ্ম্মঃ—শ্রীমদ্ভাগবতে মহাজন বাক্যে প্রকাশ এই যেঃ—

"এবমব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুত চিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি
গায়-ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥"

অর্থাৎ ভগবত ভজন পরায়ণ ব্যক্তিগণের এই প্রকার হইয়া থাকে যে, তাঁহারা যখন তাঁহাদের প্রিয় ভগবানের নাম কীৰ্ত্তন করিতে থাকেন, তখন অনুরাগে তাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হয়, আর লৌকিক বাহ্যভাব লুপ্ত হইয়া তাঁহারা অবশে উচ্চৈঃস্বরে কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও নৃত্য করিতে থাকেন। এই হাসি

কান্না প্রকাশেই যে নিত্যমুক্ত ভক্তগণের ধর্ম্মকর্ম্ম প্রকাশ, তাহা প্রাচীন মহাজনগণ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। যাহা প্রাচীন মহাজনগণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই যে এখনও বর্ত্তমান, তাহা এই হাসিকান্না-ধর্ম্ম নাম প্রকাশ করিয়া বাক্‌দেবী স্পষ্ট সাক্ষী দিতেছেন।

আর বলে কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম বা গুরুভজা ধর্ম্ম। কর্ত্তা—গুরুকে বলা হয় বা কৃষ্ণকে বলা হয়। গুরু কৃষ্ণ ভিন্ন নহে।

স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিয়া মোক্ষ প্রদান করিব।

স্বয়ং শিব বলিয়াছেনঃ—

"ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং।
মম শাসন তো মম শাসন তো
মম শাসন তো মম শাসন তঃ॥"

অর্থাৎ গুরুর অধিক নাই, গুরুর অধিক নাই, গুরু হইতে শ্রেষ্ঠবস্তু কিছুই নাই, নিশ্চয় বলিতেছি গুরুর অধিক কিছুই নাই। এই আমার উপদেশ, এই আমার শাসন, এই আমার আদেশ, সত্য সত্যই এই আমার আদেশ।

সত্য সনাতন ধর্ম্ম।

"গুরুবক্তে স্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তৎপ্রসাদতঃ।
স্বাশ্রমোক্তং স্বজাতিঞ্চ স্বকীর্ত্তিং পুষ্টিবর্দ্ধিনীং
অন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গুরোরণ্যং ন ভাবয়েৎ॥"

অর্থাৎ গুরুবাক্যেতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম—সপ্রকাশ, গুরুকৃপা প্রসাদে পরাৎপর পরম ব্রহ্ম বস্তু, বর্ত্তমান লাভ হয়। স্বাশ্রম বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান, স্বজাত্যাভিমান জনিত কর্ম্ম, এবং স্বকীর্ত্তি পুষ্টিবর্দ্ধন কার্য্য, প্রভৃতি অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ একান্ত ভাবে গুরুই ভজনা করিবে।

অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গুরু বা কর্ত্তা ভজন যে সত্যধর্ম্ম, তাহা সজ্জনগণের বাক্যে বাক্যেই প্রকাশ আছে, সুতরাং গুরুভজা বা কর্ত্তাভজা বাক্যেতে সত্য সনাতন ধর্ম্মের মহিমাই প্রকাশ পায়। "মায়ামুগ্ধজীবের নাই কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান"। যে—আমি কে অর্থাৎ নিজে কে—তাহা জানে না, গুরু কে বা কর্ত্তা কে তাহার কিছুই যে অবগত নহে, এমন ব্যক্তিও গুরুভজা বা কর্ত্তাভজা বলে। তবেই দেখা যায় বাক্‌দেবী অন্তরালে থাকিয়া সত্যের মহিমাই গাহিতেছেন।

ন্যাস-ধর্ম্ম যে বলে—ইহাত বেশ কথা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে চৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থে স্থানে স্থানে ন্যাসীশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সেই হিসাবে ন্যাস-ধর্ম্ম বলিলে প্রভুর নিজধর্ম্মই বুঝায়। "লুকাইলেন মহাপ্রভু নিজধর্ম্ম লইয়া" লুকাইত ধনপ্রকাশক ঢেঁড়া—যে শব্দে হইতেছে, তাহাতে আপত্য করিবার বিষয় কি আছে।

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
না সৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতংগুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

যে স্থানে এক মনের কারবার, সেখানেই মহাজনের কারবার। তাই মহাজনের পন্থিগণ বা মহাজনের ব্যবসাদারগণ গাইয়া থাকেন—

গীত।

"আয় আয় কে নিবি রস ওজন।
এল প্রেম রসের রসিক মহাজন॥
ওজনে নাই প্রবঞ্চনা, পিরীতের মন ষোল আনা,
আনন্দ রস নেনা দেনা, মিলেনা আর এমন॥
মহাভাবের মহাজনী, চিন্ময় রসের প্রবল ধনী,
মন ভেঙ্গে নাই বিকি কিনি, গোলদার ফড়ের মতন॥
যেমনি দেনা তেমনি নেনা, নগদ বিক্রি ধার রাখেনা,
ব্যাপার মাত্র আনাগোনা, সৎ কথা আলাপন॥
শুদ্ধ রসের ব্যবসা করে, সদাই যায় সাগর পারে,
এনে বেচে সস্তাদরে, কেনে রসিক সুজন॥"

একমনে মহাজনের কারবার, সজ্জনগণ মুখে সর্ব্বদাই শুনা যায়, কিন্তু বাক্‌বাণী যে সাধারণের কণ্ঠে বসিয়া একমুনি ধর্ম্ম নাম প্রকাশে, ইহাই মহাজনের পন্থা বলিয়া জগতকে ডাকিয়া বলিতেছেন, ইহা কেহই লক্ষ্য করিতেছেন না।

সত্য সনাতন ধর্ম্ম।

গ্রাম বা ব্যক্তির নাম ধরিয়া ধর্ম্মের উল্লেখে বড় সুন্দর এক ধন্যবাদ কীর্ত্তন হইতেছে। এই সত্য উদয়-ভূমিও ধন্য, যে পাত্রে প্রকাশ সেও ধন্য, তাই এই ধন্যবাদ কীর্ত্তন জন্যই গ্রামের নাম বা ব্যক্তির নাম দ্বারা ধর্ম্মের পরিচয় দিয়া বাক-বাণী সত্যের মহিমাই কীর্ত্তন করিতেছেন। লোক মুখে এইরূপ আরো কত নাম যে হইয়াছে, আরো কত যে হইবে তাহার ইয়ত্তা কি? এই সকলে আপত্য করিবার কি কারণ আছে, বরং এসব মহিমা দেখিয়া শুনিয়া ভক্ত-হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। তবে ইহা বলিতে পারেন যে, এই সব নামের অর্থ যদি এত ভাল, তবে ইঁহারা নিজে এসব নামের মধ্যে কোনটাই বলেন না কেন? ইহার কারণ এই যে, এই সব ভাষা খণ্ডশঃ মহিমা ব্যঞ্জক : তাই তাঁহারা নিজ মুখে বলেন না। সত্য সনাতন ধর্ম্ম বলিলে ভাষায় সত্যের পুর্ণতার ক্ষুণ্ণতা হয় না। তাহাতেই নিজে বলিতে হইলে সত্য সনাতন ধর্ম্মই বলেন।

চির প্রচলিত সত্য

সাধারণে জ্ঞাত নয় কেন ?

প্রশ্ন=পূর্ব্বে বলিয়াছেন, এই ধর্ম্ম—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারি-যুগেই প্রচলিত। এমন চির প্রচলিত ধর্ম্ম এখানে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই কেন? এখনও অনেক জায়গায়,—লোকে, এই ধর্ম্মের কিছু দেখে নাই বা শুনে নাই কেন? এত কালের প্রচলিত হইলেত সকলেই কিছু না কিছু খবর পাইতে পারিত।

উত্তর=না, ইহা সকলে খবর পাইবারত নয়; তাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—'কোটীতে মিলেনা গুটী'। আর সকল সময় একস্থানে ইহার উদয় থাকে না। এক এক সময়ে এক এক জায়গায় ইহার উদয় হয়। বিশেষতঃ সময় না হইলে কাছে থাকিলেও কেহ ইহা লক্ষ্য করে না। কোন স্থানে ইহার উদয় হইলে, সর্ব্বসাধারণ যদিও ইহা গ্রাহ্য না করিয়া তাচ্ছল্য ভাবই প্রকাশ করে, তথাপিও ইহার বাহ্যদৃশ্য দেখিতে শুনিতে পায় বলিয়াই সেই স্থানের সর্ব্ব সাধারণ লোককেও সৌভাগ্যবান বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতরূপে কাণ দেয় না বলিয়াই সত্য লাভের বা সত্য অবগতির সৌভাগ্য জন্মে না। নবদ্বীপে উদয় কালে সেই সময়-কার নবদ্বীপের পাষণ্ডীগণকেও চৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থে সৌভাগ্য-বান বলা হইয়াছে।

সত্য সনাতন ধর্ম্ম।

চৈতন্য ভাগবত মধ্য খণ্ডে ৮ম পরিচ্ছেদে লিখিত আছেঃ—

"এই মত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল।
তথাপিও মহা ভাগ্যবন্ত সে সকল॥
প্রভু সঙ্গে একত্রে জন্মিল এক গ্রামে।
দেখিলেক শুনিলেক এ সব বিধানে॥"

যে স্থানের সৌভাগ্যের উদয় হয়, সেই স্থানেই এই ধর্ম্মের প্রকাশ হইয়া থাকে. তাহাতেই সেই স্থানের লোকে যে যতদূর হয়. দেখে শুনে। কিন্তু সত্য অবগতির সৌভাগ্য সাধারণের হয় না। জন্ম জন্মান্তরের বহু সুকৃতি ফলে যাহারা বিশেষ সৌভাগ্যবান, তাহারা ব্যতীত এই খবর শুনিয়াও কেহ কাণে শুনে না. চোখে দেখিয়াও দেখে না। সৌভাগ্যে সেই শুভ সময় উপস্থিত হইলে অতিদূরে থাকিলেও সে দূরে নয়. অতি কাছে; অনায়াসে তার কাছে সব সুখবর যায়। তাহাতেই অনেক দূরের লোকও আসিয়া ইহাতে যোগ দেয়, কাছের অনেক লোকে বাহ্য দৃশ্য অনেক দেখিয়া শুনিয়াও ইহা লক্ষ্য করে না।

প্রশ্ন=সত্য ধর্ম্মত সকলের জন্যই. তবে সকলে খবর পাইবার নয় কেন? কোটীতে গুটী কেন?

উত্তর=দাতা সকলকেই অমূল্য ধন দানে মুক্ত হস্ত, কিন্তু গ্রহীতা কয়জন মিলে? সর্ব্বসাধারণে এই অমূল্য ধন লোটাইবার জন্য দয়াল দাতা এক এক সময়ে এক এক স্থানে বাজার বসাইয়া থাকেন, কিন্তু ভবের জীব অসার অনিত্য রসে এত উন্মত্ত যে. তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চায় না। কৃপায় সেধে যাচিলেও ভাও শু'নে পিছুয়ে পড়ে। সৌভাগ্যে অমূল্য ধনের নমুনা সাক্ষাৎ

হইলেও কিছু নয় কিছু নয় বলিয়া দূরে পলায়ন করে। নবদ্বীপে যখন হাট বসিল, তখন গ্রামবাসী অনেক লোকে তাচ্ছল্য ভাবে নানা কথা বলিয়াছিল, তাহা চৈতন্য-ভাগবত, কি চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ দেখিলে জানিতে পারিবেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে এ সব সজ্জনের সমাগম হইত বলিয়া তাঁহার বাড়া ঘর গঙ্গার স্রোতে ভাসাইয়া দিতে পর্য্যন্ত পরামর্শ করিয়াছিল। আর ইঁহাদের ভাবের ও কাযের রকম দেখিয়া কত রকম ব্যঙ্গোক্তিই না করিয়াছে। চৈতন্য ভাগবত ৮ম পরিচ্ছেদে মধ্য খণ্ডে আছে ঃ—

"কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লোকাইয়া॥
কেহ বলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত॥
কেহ বলে হেন বুঝি পূর্ব্বের সংস্কার।
কেহ বলে সঙ্গ দোষ হইল তাহার॥
নিয়ামক বাপ নাই তাতে আছে বাই।
এত দিনে সঙ্গ দোষে ঠেকিল নিমাই॥
কেহ বলে পাশরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ॥

. . . . . .

. . . . . .

কেহ বলে কালি হউ, যাইব দেয়ানে।
কাঁকলি বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে॥

যেনা ছিল রাজা দেশে আনিয়া কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি—জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়॥
থলিয়াতি শ্রীবাসের কালী করো কার্য্য।
কালি বা কি করো দেখ অদ্বৈত আচার্য্য॥
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ—অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এতরূপ॥"

. . . . . .

"কেহ বলে এগুলা দেখিতে না জুয়ায়।
এগুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়॥
ও নৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেহো এইমত হয়,—দেখ পরতেখে॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এ গুলার সঙ্গে তার হেন হইল চিত॥"

. . . . . .

"কেহবলে না দেখিল নিজকর্ম্ম দোষে।
'সে সব সুকৃতি' তা'সভার বলি কিসে॥
সকল পাষণ্ডী—তারা এক-চাপ হৈয়া।
'এ সেই গণ' হেন বুঝি যায় ধায়া॥
ও কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ।
জন শত বেড়ি যেন করে মহাদ্বন্দ॥

পরিহাসে আসে সবে দেখিবার তরে।
দেখিত পাগল গুলা কোন কর্ম্ম করে ॥”

. . . . . .

“পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলা গলি করি সবে হাসিয়া পড়য় ॥
পুন ধরি লই যাই—যেবা নাহি দেখে।
কেহ বা নিবর্ত্ত হয় কারো অনুরোধে ॥
কেহ বলে “ভাই! এই দেখিল শুনিল।
নিমাই পণ্ডিত লইয়া পাগল হইল ॥
দুর্দ্দুরি উঠিয়া পাছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেয় হুড়াহুড়ি ॥
‘হই হই হায় হায়’ এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অপযশ-বাণী ॥
মহা মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র যথায়।
হেন ঢাঙ্গাইত গুলা বৈসে নদীয়ায় ॥
শ্রীবাস-বামন এই নদীয়া হইতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি লইয়া ফেলাইব স্রোতে ॥”

. . . . . .

চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে।
বহির্ম্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে ॥”

সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের ব্যবহার এইরূপ, কিরূপে তাহারা ইহা অবগত হইবে? এখনও ঐরূপ কত লোক কত কথা বলিতেছে।

বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়াও দেখে না--শুনিয়াও শুনে না। অন্তর্ম্মুখীন ভক্ত ব্যতীত কেহই ইহার খবর পায় না বা লয় না। এই সব বহির্ম্মুখ জীবগণকে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া আপন করিয়া লওয়ার জন্য দয়াল দাতা যে কত রকম চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা আর কি বলিব। তবু জীব তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহে না। নবদ্বীপে বহির্ম্মুখগণ কত রকম কত ব্যবহার করিয়াছে, তাহার কতক বলিলাম--আরও কত আছে। আর এই সব জীব যে তাঁহার প্রতি তাচ্ছল্য ব্যবহার করিয়া অপরাধী হইতেছে, সেই অপরাধ মুক্ত করিবার জন্য প্রভু ব্যাকুল হইয়া আপনার দরদি ভক্তগণের অন্তরে দুঃখ দিয়াও সন্যাসী সাজিলেন।

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলা ৮ম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে ঃ—

"পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপায় প্রভু করিল সন্যাস॥
সন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দোষ পাইবে নিস্তার॥"

হায়! হায়! হায়! নিত্যদাস জীবগণকে কুহকিনী—মায়ায় বহির্ম্মুখ করিয়া কি অন্ধই করিয়াছে। দয়াল প্রভু জীবের অপরাধ মুক্ত

করিয়া কুহকিনীর আবরণ হইতে তুলিয়া ক্রোড়ে লইবার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। তবু মায়ার দাসগণ মায়া ছাড়িতে পারিল না, অতি অল্প লোকেই তাঁহাকে গ্রহণ করিল। সাধারণে গ্রহণ করিল, কেবল--তাঁহার বাহ্য ব্যবহার ; গ্রহণ করিল, কেবল—তাঁহার বাহ্য বেশভূষা ; গ্রহণ করিল, কেবল—তাঁহার বাহ্য প্রচারিত বোল হরিবোল। হরিবোল, হরিবোল হরিবোল, মুখে বলিতে মাত্র শিখিল—তাঁহাকে লইল না। তিনি যে অমূল্য ধন যাচিয়া দ্বারে দ্বারে—দেশে দেশে ঘুরিলেন, তাহা কয়জনে লইল !

চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলার ১৭শ পরিচ্ছেদে প্রকাশ আছে, প্রভু কাশীতে গিয়া বলিয়াছিলেনঃ—

> "ভাব কালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
> গ্রাহক নাহি, না বিকায় লইয়া যাব ঘরে ॥
> ভারি বোঝা লইয়া আইলাম কেমনে লইয়া যাব।
> অল্প স্বল্প মূল্য পেলে হেথাই বেচিব ॥"

জীবের দুঃখ দেখিয়া প্রভুই আউল হইলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতিকে জীব উদ্ধার কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। ভবসাগর মগ্ন জীবগণ সাগর জলে হাবু ডুবু খাইয়াও কাণ্ডারী চিনিয়া ধরিল না। অদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন—"আউলকে বলিও বাউল, হাটে না বিকাল চাউল।" এই বিষয়টী চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে প্রকাশ

আছে যে, প্রভু জগদানন্দকে শচী মাতার নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে মাকে বলিও—

"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিনু সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈনু সর্ব্বনাশ॥"

জগদানন্দ শচী মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া কালে, অদ্বৈতাচার্য্যও জগদানন্দের নিকট যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও এই স্থলে লিখিত আছে, যে—

"তরজা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে॥
প্রভুকে কহিও আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কালে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

অদ্বৈতাচার্য্য হইতে এইরূপ সংবাদ পাইয়া প্রভু আরো ব্যাকুল হইলেন। ভাবিলেন—এ বেশে আর কেহ গ্রহণ করিবে না। এ বেশ জীবের মনতুষ্টিকর বটে, কিন্তু তুষ্টিকর বলিয়াই কেবল বাহ্যই নেয়, বাহ্য তুঁষে তুষ্ট হইয়া অন্তরঙ্গ সার চাউল কেহ নিতেছে না। তাহাতেই বেশ ছাড়িয়া লুকাইলেন। যে বেশ অতি হীন, যে বেশ জগতের চক্ষে কোন প্রকারে গ্রাহ্য যোগ্য নয়, তাহা লইয়াই জগতে

বিকাইতে চলিলেন। পরে এ যাবত যাহা ক্রমে হইতেছে, তাহা বিশেষ কোন গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। কোন কোন সময় কিছু কিছু লিখিত হইলেও তাহা ততটা কেহ লক্ষ্য করেন না। সজ্জন মুখে ক্রমশঃ এখনও সব কথাই সজ্জন সমাজে প্রচার আছে। এই স্থলে ইহার কিছু বলিতেছি। পরে এক সময়ে বাইশ ফকিরের উদয়স্থানে. দয়াল দাতা ফকির ঠাকুর—জীবে অপরিসীম দয়া হেতু সর্ব্ব সাধারণের রাস্তায় দাঁড়াইয়া—রাস্তার লোককে ধরিয়া কখনও বা গলায় কাপড় দিয়া বাঁধিয়া বলিতেন—"তুই কি আমার কিছু ধারিস্? দুষ্ট, এই ধার ভুলিয়া নিজ সুখে যথাতথা বেড়াস, একবার স্মরণও করিস্ না।" এই কথাতে অনেকেই বিরক্ত হইয়া নানারূপ ক্রোধ প্রকাশ করিত, তাহাতে তিনি "তুই নয় তুই নয়" বলিয়া বিদায় দিতেন। কেহ কেহ পাগল বলিয়া নানা কথায় প্রবোধ দিয়া তাঁহার কাছ ছাড়িয়া চলিয়া যাইত।

আর বহু বৎসর হইল এক জায়গায় সজ্জন সমাজে প্রকাশিত একটী গান বলিতেছি শুনুন।

কবির সুর।

চিতান—এরা স'বে কি সাগরের ঢেউ হয়ে বালির বাঁধঃঃ পঙ্গু কি লঙ্ঘিবে গিরি বামন কি ধরতে পারে চাঁদঃঃ যাদের সেরেকৃকে পর্ণ্ডার ধোকা, নূতন দোকানদারঃ করছে সব আদার বেপারঃ জানবে কি প্রেমরসের কারবারঃঃ তুমি গুছায়ে গাছায়ে কাছিয়ে দিবেঃ পিছুয়ে যাবে ভাও শুনেঃ॥

ধুয়া।

কাজ কি রসিককে তোমার এদেশে এনেঃ। যদি অতল-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র আসেঃ যাবে ভেসেঃ উঠবে গে জল নাক্ জিনেঃঃ॥ থাকবে কোথায় কেবা তায় রাখবে যতনেঃ সে যে দুরারাধ্য কার বা সাধ্য বাধ্য করে তায়ঃ মত্ত সব অর্থ লোভে যথার্থ বলতেছি তোমায়ঃ এরা সেজে দোকান আদা নিয়ে বসেছে বাদা বনেঃঃ॥

অন্তরা।

ভাই এদেশের বেসাত পুঁজিঃ সকলিত জানঃ চাঁদের সুধা অসুরের ভাগ্যেতে তা হবে বল কেনঃঃ জেনে শুনে দেশের ভাও আসতে বল তায়ঃ৹ জহুরী না হলে জহর চিনতে কে পেরেছে কোথায়ঃ৹ সে জাহাজ ভরে—বুঝাই ক'রে আন্ছে যে সব মালঃ যাচ্‌বে তার জিনিস রকম এদেশে নাই এমন দালালঃ এরা কাঁচ্চা ছটাক খাস্ছা চিনে পশুরির কি নাম জানেঃঃ॥

অন্তরা।

সেই রসিকের আদেশে এক বন্যা এসেছিলঃ—খালি ঝুলি সকলি এক হলঃ আর তুম্বা ভেসে গেলঃঃ তার কটাক্ষেতে হলো এই আসলে বা কি হয়ঃ দেখিতে বাসনা বটে কিন্তু সে আসতে করি ভয়ঃ৹ এরা হাটে মাটে মাথায় মুটে করছে ব্যবসাঃ কিস্তির আমদানী রেখে এদেশে মিথ্যে তার আসাঃ কারো এক কাহনে ব্যবসা চলেঃ কেউ বা সারে আট পণেঃঃ॥"

এর পর অন্য আর একস্থানে এই হাট বসিলে ইঁহাদের মুখে এক সময়ে গান প্রকাশ হইয়াছিল।

রাগিণী মিশ্র—তাল খেমটা।

"রইল মনে মনের বেদনা।
সহজ প্রেম সস্তা দরে, দরদ করে কেউ নিলে না॥
কারে বা কই সে কথা, দরদি পাইবা কোথা,
অরণ্যে রোদন বৃথা. সে রসেতে কেউ ডুবে না;
সেই নন্দের নন্দন যার লাগি, নদে কৌপীনধারী সর্ব্বত্যাগী,
শ্রীরাধার প্রেমের লাগি, রাখতে নার্‌লে ঠোর ঠিকানা॥
জহুরী খুল্লে দোকান, হীরে কাচ সমান দুখান,
নকলে হয় যত্নবান, আসলে চেয়ে দেখলে না;
সেই খেদে কয় ধনের ধনী, উঠল সাচা মালের বিকি কিনি,
মুটে মজুর আমদানি, বেঙ্গা পিতল বলছে সোণা॥"

এইত পূর্ব্বের কথা কতই বলিলাম। আর বর্ত্তমানে যা হতেছে—তা হতেছে, যে জানে—সে জানে, যে দেখে—সে দেখে, ইহা বলিবার বিষয় নহে। দয়াল দাতা সকলকেই এই অমূল্য ধনে ধনী করিতে প্রস্তুত, কিন্তু চায় কয়জনে—নেয় কয়জনে। ভবের জীব অসার অনিত্য রসে ডুবিয়া সেই সত্য, নিত্য পরমানন্দ রসে তাচ্ছল্য ভাবে অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দেয়, গায় পড়িয়া মুখে তুলিয়া দিলেও গ্রহণ করে না। তাহাতেই চির প্রচলিত সত্য, জগতে কোন কোন স্থানে মাত্র কয়েক জন মধ্যে সপ্রকাশ থাকিয়া সর্ব্ব সাধারণে অপ্রকাশ রহিয়াছে।

বিশেষতঃ এ যে কলিকাল। এ সত্য সঙ্গে জগতের সাধারণের কোন প্রকার যোগ হইলেই যে সত্যযুগ উপস্থিত হইয়া কলি উড়িয়া যায়। যে দিন এ সত্য সঙ্গে সমগ্র জগতের কোন না কোন প্রকারের যোগ হইবে, সেই দিন জানিবে আর কলি নাই।

মালা তিলক বেশ ভূষা নাই কেন?

প্রশ্ন=আচ্ছা, এখন অন্য একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আমরা ত সাধারণতঃ বুঝি, মালা তিলক যাঁহারা ধারণ করেন, মালা তিলক যাঁহারা মান্য করেন, যাঁহারা মাথায় শিখা ধারণ করেন, তাঁহারাই চৈতন্যের অনুসরণ করেন। আপনাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ কেহ মালাধারী, শিখাধারী দেখা যায়, নতুবা কাহাকেও এরূপ ব্যবহারে লিপ্ত দেখা যায় না। অথচ চৈতন্যের কথাই বলেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের ধর্ম্ম বলিয়াই যেন প্রকাশ করেন—ইহাত বুঝিতে পারিলাম না।

উত্তর = বুঝিতে পারিলেন না? বাস্তবিকই প্রভু নবদ্বীপে মালা তিলক ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী-বেশ ধরিয়াছিলেন, তাহাত পূর্ব্বেও বলিয়াছি; কিন্তু তিনি মালা তিলক ধরাইবার জন্য মালা তিলক ধারণ করেন নাই। মালা তিলক বহির্ম্মুখ জীবে মানে বলিয়াই অপরাধী জীব হইতে ঐ সাজে কৌশলে মান্য নিয়া অপরাধ মুক্ত করিবার জন্য এই বেশ ধরিয়াছিলেন। মালা তিলক ধর্ম্ম তিনি কখনও কাহাকে দিতে চান নাই। তখনও প্রভু দিতে চেয়েছিলেন—আত্মতত্ত্ব, দিতে চেয়েছিলেন—গুরুতত্ত্ব, দিতে চেয়েছিলেন—প্রেমতত্ত্ব; তাহা না নিয়া বাহিরের বেশ ভূষা মালা তিলক নিয়া মুখে হরি-বোল হরি-বোল বলিয়া সারশূন্য নৃত্যগীতেই লোক মাতিতে লাগিল।

"মালা তিলক করিয়ে বেশ, ভজনের নাহিক লেশ,
ফিরে মাত্র লোক দেখাইয়া।"

ইহাতে কেবল অভিমান মাত্রই বাড়াইয়া থাকে। ভেক গ্রহণ করিয়াই মাতা, পিতাকেও ভক্তি করে না; কেবল সকল হইতে ভক্তি লইতেই যত্নবান হয়। তাহাতেই—"সহজ ভজন হলো না ব'লে" ঐ সাজ ছাড়িয়া লুকালেন।

নিজে ঐ মালা তিলক ব্যবহার করিয়া বড়ই ঠকিয়াছেন। এখন ঠকিয়া শিখিয়াছেন, আর ঐ ব্যবহার করেন না, অথবা সঙ্গীদেরও করান না। তবে দুই একটীর যে মালা, শিখা—তাহা পূর্ব্ব হইতেই যাহার যে লৌকিক ব্যবহার ছিল—তাহা রক্ষা করিবার জন্যই আছে, অপর কিছুই নহে। বহির্সাজ—যাহার যাহা দ্বারা লৌকিকতা রক্ষা হয়—তাহাই করা হইয়া থাকে। বিধিবদ্ধ কোন আচারে ইঁহারা

বদ্ধ নহেন। ইঁহাদের ধর্ম্ম বেদসম্মত বটে কিন্তু বেদাতীত। বেদ-সম্মত বলিয়াই যাহার যাহা বৈধ রীতি, তাহা রক্ষা করেন। ধর্ম্ম যাহা. তাহা—বিধির অতীত। ইহা অন্তরঙ্গ নিত্যমুক্ত আত্মার স্বধর্ম্ম। সত্যানুরাগে সত্য নিত্য মানুষের আশ্রয়ে—অন্তরঙ্গ প্রকাশে. এই ধর্ম্ম উদয় হয়। ইহা বিধিকর্ম্ম জনিত ধর্ম্ম নহে। যাঁহারা সত্য নিত্য পরম পদাশ্রয় এ জীবনে পাইবেন বলিয়া আশা করেন না বা সত্য লাভের প্রার্থী নহেন, তাঁহাদেরই জন্য বিধি ধর্ম্ম। তাঁহারা যে যাহা করুন, তাহাতে ইঁহাদের কোন আপত্য নাই। এসব কথায় জ্ঞানকল্পিত বৈধধর্ম্মের অসারতা প্রকাশ পায়। তা কি করা যায়, সত্য কি—ইহা প্রকাশ করিতে গেলেই, মিথ্যা কি—তাহা আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। চাউল দেখাইতে গেলেই ধান হইতে তুঁষটী খসিয়া পড়ে। তাহাতেই তুঁষে যত্নশীল ব্যক্তির এসব সত্য কথায় অসন্তুষ্টি হয়, তাহা কি করা যাইবে। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, কেহকে তাচ্ছিল্য করিবার জন্য ইঁহাদের কোন কথা হয় না। যাক্—যে বাহ্য ব্যবহারের কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন. তাহা সকল সময় এক রকম থাকে না। দেশ. কাল, পাত্র ভেদে ও উপস্থিত প্রয়োজন ভেদে, ইহা সর্ব্বদাই রকম রকম। কিন্তু অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম যাহা, তাহা চিরকালই এক রকম। ইহার রকম ভেদ কোন অবস্থাতেই নাই। যে বাহ্য বেশ ভূষা এখন দেখেন না বলিয়া আপনার প্রশ্ন, তাহা কোন সময়ে প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া লইয়াছিলেন; প্রয়োজন হইলে আর যে লইবেন না—এমনও নহে। বর্ত্তমানে ঐ বেশ ভূষার প্রয়োজন নাই। তাহাতেই এই ব্যবহার করেন না, গতিকে ইঁহাদের মধ্যে মালা, তিলক, শিখা দেখেন না।

অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত ইঁহাদের ঐক্য দেখা যায় না কেন?

প্রশ্ন = এই জগতে অনেক রকম ধর্ম্মই প্রচার আছে। সবগুলির নাম জানিও না. উল্লেখ করার প্রয়োজনও নাই। যে কয়েকটী আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি, ইহার মধ্যেই কয়েকটীর নাম করিয়া বলিতেছি। হিন্দু মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব আর অন্যান্য—খৃষ্টান, মহম্মদীয় ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম এখানে প্রচার আছে। ইঁহাদের কারো সঙ্গেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনাদের ঐক্য দেখা যায় না, অথচ শাক্তের উপাস্য—শক্তির মহিমা, শৈবের উপাস্য—শিবের মহিমা, বৈষ্ণবের উপাস্য—বিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, খৃষ্টানের উপাস্য—খৃষ্টের মহিমা, মহম্মদীয়ের উপাস্য—হজরৎ নবির মহিমা. এবং ব্রাহ্মের উপাস্য—ব্রহ্মের মহিমা আপনাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়; অথচ এই এক এক জনের মহিমা বলিতে বলিতে, শুনিতে শুনিতে আপনারা কি এক বিহ্বল হইয়া যান। ইঁহাদের উপাস্যের মহিমা গাহিয়া এরূপ ভাবে বিভোর হন, অথচ এই সব ধর্ম্মীর সঙ্গে আপনাদের ধর্ম্ম-সংস্রব নাই কেন?

উত্তর = শক্তির সঙ্গে দেখা নাই—শাক্ত; শিবের সঙ্গে দেখা নাই,—শৈব, কৃষ্ণ, বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা নাই—বৈষ্ণব, খৃষ্টের সঙ্গে দেখা নাই—খৃষ্টান, হজরৎ নবির সঙ্গে দেখা নাই—মহম্মদীয়, ব্রহ্মের সঙ্গে দেখা নাই—

ব্রাহ্মের সঙ্গে বাস্তবিকই ইঁহাদের কোন ধর্ম্ম সংস্রব নাই। বর্ত্তমান লইয়া ইঁহাদের সব কারবার। বর্ত্তমান আরাধনার নামই—সত্যধর্ম্ম। আনুমানিক ভাবনা অথবা কাল্পনিক হাত গড়া, কি মনগড়া উপাস্যের, ইঁহারা উপাসনা করেন না। বর্ত্তমান সত্য যাঁহারা চান না, বর্ত্তমান সত্য কিছু আছে বলিয়া যাঁহাদের মনে কিছুই বিশ্বাস নাই, তাঁহারাই আনুমানিক ভাবনা ভাবেন; এবং সত্য নিত্য বর্ত্তমান ছাড়িয়া কাল্পনিক, হাত গড়া—মনগড়া উপাস্যের উপাসনা করেন। এঁদের সঙ্গে এই সব সজ্জনের ধর্ম্ম ভাবের একতা হওয়ার কোন কারণ নাই; বরং এসব সজ্জন মুখে সত্য বর্ত্তমান বলিয়া প্রসঙ্গ শুনিলে, ঐ সকল জ্ঞান কর্ম্ম ধর্ম্মশীলগণ উপহাস করিয়া থাকেন,—রাগ করেন, বিরক্ত হন। কি ক'রে তাঁদের সঙ্গে এঁদের ধর্ম্মভাবের একতা হয়? এসব দৃশ্য দেখিয়া সজ্জনগণ গাহিয়াছেনঃ—

রাগিণী—কালাংড়া, তাল—আড়খেমটা।

"প্রভু দৃষ্টমান বচনে, লোকে উপহাসে শু'নে,
নমঃ নমঃ কোটী কোটী অবিদ্যার চরণে।
হায় কি মহামায়ার কহোর, অরুণ উদয়ে অন্ধকার ঘোর,
জহুরী না হলে জহর, দেখিবে কেমনে।
পূর্ণ শশীর হলে উদয়, চকোরের জগত সুধাময়,
পেঁচার অসম্ভব মনে হয়, শুনিয়ে শ্রবণে।
চোক ক্ষরেছে বিষয় বিষে, বর্ত্তমানে লাগে দিশে,
অকারণ রাহুর গ্রাসে, বেদ বিধি বিধানে॥"

প্রশ্ন=তবে কি এরা কেহই সত্য লাভ করে নাই? এদের কারো কাছেই সত্য বর্ত্তমান হইবে না?

উত্তর=সত্য বর্ত্তমান আছে। বিশ্বাস যাহাদের অন্তরে নাই, সত্য লাভ তাদের কিরূপে হয়? সত্য বর্ত্তমান আছে—বিশ্বাস না হইলে, সত্য লাভের পিপাসা না জন্মিলে, সত্য মানুষের আশ্রিত না হইলে কি করিয়া হইবে? সত্য লাভের সত্য পিপাসায় সজ্জনের আশ্রিত হইলে সকলেরই হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?

প্রশ্ন=পূর্ব্বে একবার বলিয়াছেন, নবদ্বীপে কয় জনে তাঁহাকে লইয়াছিল। এখনত আমরা দেখিতেছি—হা গৌরাঙ্গ, হা নিতাই রবে নবদ্বীপ প্লাবিত। এখন পর্য্যন্ত যাঁহার নামে এত জয় জয় ধ্বনি, তাঁহাকে লইল না বলেন কিরূপে?

উত্তর=এখন যা দেখিতেছেন—এ প্লাবিত নয়, মুখরিত বলেন। গৌর নিতাই যে দিন সেখানে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই দিন তাঁহাদের প্রেম বন্যায় সঙ্গী, আনুসঙ্গী, পার্ষদগণকে প্লাবিত করিয়া প্রেমানন্দ সাগরে ভাসাইয়া ছিলেন। তাহাই সাধারণ বহির্ম্মুখ জীব গ্রাহ্য করে নাই বলিয়াছি। এখন তাঁহাদের সঙ্গে কারো দেখা সাক্ষাৎ নাই। বন্যা উথলিবে কোথা থেকে? এখন কেবল মুখে মুখেই—মুখরিত। বদ্ধ জীবের স্বভাবই এইরূপ। বর্ত্তমান গ্রাহ্য করে না, গত বিষয় লইয়া কেবল মুখের আড়ম্বর বাড়াইয়া থাকে। গ্রাম্য একটী কথায় আছে—"মৈলে গাভী ঘিওয়ালী হয়।" নাই গাভীর গুণ, অতিশয় আড়ম্বরের সহিত বাখানে ফল কি? কেবল সেখানের কথা নয়, মায়ামুগ্ধ জীবের ব্যবহার সবস্থলেই

এইরূপ। ছিল শুনিয়াও—আছে কোথায়, তাহা খুঁজে না : ছিল বিশ্বাস করিয়াও বর্ত্তমান বিশ্বাস করে না। ছিল—মানে, আছে শুনিতে চায় না। ইহার জন্যই ধর্ম্ম করিয়াও সত্য ধর্ম্ম হয় না। গাভী দেখে নাই, ঘৃত দেখে নাই, ঘৃত খায় নাই, মুখে খুব গুণ বাখানে; ইহাও এক রহস্য জনক সুন্দর দর্শন। অবোধ শিশুর বালি দিয়া ভাত রান্না খাওয়া দেখিয়া যেমন জগতের প্রবীন জ্ঞানী ব্যক্তিগণও এক আমোদ ভোগ করেন, সেইরূপ এই সব ধর্ম্মের খেলাও সজ্জনগণ আনন্দেই দেখিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কাল প্রভাবে কলি এই আমোদের ধুলা খেলাও নষ্ট করিয়া দিতেছে! দিতেছে কি—প্রায় সবই দিয়াছে!! ইহার মধ্যে কলি প্রবেশ করিয়া নিজের কুপ্রবৃত্তি সফল করি-তেছে, কলির প্রতিজ্ঞা—"তীর্থ ব্রত ক্রিয়া নষ্ট করিব সকল"। সব প্রায় শেষ করিয়াছে—আর বাকী নাই। এসব কথা বলিতে আর ইচ্ছা করি না, এ সময়ে এই সত্য কথা প্রকাশ করিলে, অনেকেরই অপ্রিয় হয়। অন্য কথা থাকিলে বলেন। আধ্যাত্মিক সত্য-ধর্ম্মের বা সত্য-ধর্ম্মীর কথা ব্যতীত, মন জ্ঞানের কল্পনাময় ধর্ম্মের বা ধর্ম্মীর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। আঁধারে যাদের ভালবাসা, আলোকের ইঙ্গিত দেখিলেই তাহাদের অসহ্য হয়। আলো অন্ধকার যেমন একত্রিত হওয়া অসম্ভব, আধ্যাত্মিক সত্য-ধর্ম্মের সঙ্গে ভ্রান্তিময় মন জ্ঞানের কাল্পনিক ধর্ম্মের ও ঐক্য হওয়া তেমনি অসম্ভব।

অন্যান্য ধর্ম্মে—কারো কারো বর্ত্তমান লাভ হইয়াছে—শুনা যায় কেন ?

প্রশ্ন=আপনার কথা শুনিতে শুনিতে আমার অন্তরে একটী প্রশ্ন উঠিয়াছে। দুইটী ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিতেছি না। ইহাদের বর্ত্তমান লাভ হইয়াছিল শুনি বলিয়াই আমার এই প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি যে অন্যান্য ধর্ম্মে বর্ত্তমান সত্য কিছুই নাই বলিলেন, তবে রামপ্রসাদ সেন বর্ত্তমান লাভ করিয়াছিলেন শুনা যায় কেন ? রামকৃষ্ণ পরমহংস বাহ্যলুপ্ত হইয়া অনেক সময় থাকিতেন কি রকম ?

উত্তর=এত অন্যের কথা হয় নাই, এ সত্য ধর্ম্মের ভিতরের কথাই হইয়াছে। রামপ্রসাদ যদিও পূর্ব্বে বহির্ম্মুখ প্রচারিত জ্ঞান কল্পনাময় শাক্ত ধর্ম্মেই ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সেই বহির্ম্মুখ ধর্ম্মদ্বারা বর্ত্তমান লাভ করেন নাই। ইহা ছাড়িয়া সত্যের আশ্রিত হইয়া সত্য শক্তিকে বর্ত্তমান লাভ করিয়াছিলেন। বাহ্য শাক্ত ধর্ম্মে যে তাঁহার এই লাভ নহে, তাহা তাঁহার গান দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার কৃত একটী গান শুনুন।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না॥
জগতকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা ;
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস্ তায়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগতকে খাওচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা ;
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস্ তায়, আলো চাল আর বুট ভিজানা॥
জগতকে পালিচ্ছেন যে মা, সাদরে তাও কি জাননা ;
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥"

তারপর তিনি কি সূত্রে সত্য লাভ করিলেন, বলিতেছি শুনুন। বর্ত্তমান সজ্জনগণ যাহা বলেন ও প্রচারিত গান গুলিতে যাহা আছে, তাহাই বলিতেছি। রামপ্রসাদ সেন যে সময়ের লোক, সেই সময়ে সেই সব স্থানেই এই সত্য ধর্ম্মের প্রকাশ ছিল। রামপ্রসাদ সেনের বাড়ী যে হালিসহর গ্রামে, সেই গ্রামে আরো সজ্জনের বাস ছিল। অযোধ্যা নাথ গোস্বামী, যাঁহাকে লোকে আজু গোঁসাই বলিয়া ডাকিত, তিনি সত্য ধর্ম্মাশ্রিত বৈষ্ণব। তিনি সনাতন ধর্ম্মের বৈঠকের লোক। রামপ্রসাদ যদিও বহির্ম্মুখ ভাবে শাক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কতকটা ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া আজু গোঁসাই কৃপাবিষ্ট হইয়া তাঁহার পেছনে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞানকল্পিত ভাবের কথায় কথায় আপত্য করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ তাঁহার সাক্ষাতে কোন কথা কহিলে, তাঁহার ভুল বুঝাইয়া সত্যানুরাগ জন্মাইতে

তৎক্ষণাৎ আপত্য তুলিয়া সত্য কথা প্রকাশ করিতেন। আজু গোঁসাইএর সাক্ষাতে কোন গান গাহিলে, তৎক্ষণাৎ তিনি এক একটী গান গাহিয়া সত্য ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। রামপ্রসাদ কয় দিন এই কৃপা বুঝিতে পারেন নাই। পরে তাঁহা হইতে সব অবগত হইয়া সত্য ধর্ম্মাশ্রিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার সত্য লাভ। বহির্ম্মুখগণ ইহা অবগত নহে। অবগত থাকিলে আজু গোঁসাইএর এই ব্যবহার দ্বারা বহিগুলিতে তাঁহাকে পাগল কবি বলিয়া কখনই লিখিত না। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ৺নব কিশোর গুপ্ত মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনী বলিয়া একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা সাধুসঙ্গীতের এক সঙ্গে ছাপান হইয়াছে, তাহাতেও—রামপ্রসাদের সত্য সনাতন ধর্ম্মের কথা লিখিত আছে। এই গুপ্ত মহাশয়দের পূর্ব্ব নিবাস হালিসহরে ছিল, যে হালিসহরে রামপ্রসাদের বাস ছিল।

প্রশ্ন=রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইএর মধ্যে কিরূপ কথা হইত বা কিরূপ গান হইত, তাহা কি বলিতে পারেন?

উত্তর=কতক জানা আছে বটে, যতদূর জানা আছে সব বলিতেছি। যে সব বহিতে আজু গোঁসাইকে পাগল কবি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সবেও ইহার কতক কতক আছে। রামপ্রসাদের কালী কীর্ত্তনে ভগবতীর গোষ্ঠে গমন উল্লেখ আছে। তাহা দেখিয়া আজু গোঁসাই বলিয়াছিলেন:—

"না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।

তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে ॥"

এই সব কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এক সময়ে রামপ্রসাদ আজু গোঁসাইকে বলিয়াছিলেন ঃ—

"কর্ম্মের ঘাট, তৈলের কাঠ, আর পাগলের ছাট মলেও যায় না।"
তদুত্তরে আজু গোঁসাই বলিয়াছিলেন ঃ—

"কর্ম্ম ডোর, স্বভাব চোর আর মদের ঘোর ম'লেও যায় না।"
রামপ্রসাদ এক সময়ে গান গাহিয়াছিলেন ঃ—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি ॥
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুন্‌লে দুধি ভাতি,
ওরে জাননা কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি ॥
কালা কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি,
ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি ॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি,
ওরে গাছের ফলে ক'দিন চলে, কররে চারি ফলের স্থিতি ॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে ফল, পাবিরে মন শুন যুকৃতি,
ওরে ব'সে মূলে কালী ব'লে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি ॥"

ইহার উত্তরে আজু গোঁসাই গাইলেন :—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"হয়োনা মন পড়া পাখী।
ওরে বন্দি হয়ে হয়োনা সুখী॥
পাখী হলে তত্ত্ব ভু'লে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বলবে পরের বুলি পরম তত্ত্বের জানবে কি॥
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে সে ফল উড়ে খাওগে দেখি।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি॥"

রাম প্রসাদ আর এক গান গাহিলেন :—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুর তলে গিয়ে চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতা মাতায় তাড়া দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খুঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি॥

প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ. জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন মনটী হবি ॥"

আজু গোঁসাই তৎক্ষণাৎ ইহার উত্তরে গাইলেন :—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"কেন মন বেড়াতে যাবি।
কারো কথায় কোথাও যাস্‌নেরে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরে মন নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে কর্‌তে পারিস্, মাঝ গাঙ্গেতে ভরাডুবি ॥
বাঁশবনে গিয়ে ডোমকাণা হয়, এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি।
শেষে কল্পতরুর তলায় গিয়ে কি ফল নিতে কি ফল নিবি ॥"

রাম প্রসাদ আর এক সময় গাহিয়াছিলেন :—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাবগো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার;
গণ্ডযোগে জনমিলে সে হয় যে মা-খেকো ছেলে –
এবার তুমি খাও কি, আমি খাই মা—দুটার একটা কোরে লব
হাতে কালী মুখে কালী সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব—

যখন আস্‌বে শমন বাঁধবে কষে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাবো খাবো বলি মাগো, উদরস্থ না করিব,
হৃদিপদ্মে বসাইয়ে মন মানসে পূজিব ॥
যদি বল—কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব—
আমার ভয় কি তাতে কালী ব'লে কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব—
তাতে মন্ত্রের সাধন, কি শরীর পতন যা হবার তাই ঘটাইব ॥

আজু গোঁসাই তদুত্তরে গাহিলেন :—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ওযে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুণ্ডমালা কোথায় থুবি ॥
সর্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে ভূষোকালী মেখে যাবি—
আবার কালকে দেখাতে কলা নিজে যে কলা দেখিবি ॥"

এইরূপে সতের বাক্য শুনিতে শুনিতে রামপ্রসাদের বৈরাগ্যভাব অর্থাৎ সংসার অসার জ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহাতে রামপ্রসাদ গান গাহিলেন :—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"এ সংসার ধোঁকার টাটি—
ও ভাই খাই দাই করি মাটী।
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি ॥

প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষ কোটী—
যেমন সরার জলে সূর্য্যছায়া অভাবেতে স্বভাব যেটী॥
গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে প'ড়ে খেলাম মাটি—
ওরে ধাত্রিতে কেটেছে নাড়ি মায়ার বেড়ী কিসে কাটি॥
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি—
আগে ইচ্ছে সুখে পান ক'রে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে আদি পুরুষের আদি মেয়েটা—
ওমা যা ইচ্ছা হয় তাই কর মা, তুমিত পাষাণের বেটা॥"

ইহা শুনিয়া আজু গোঁসাই গাহিলেন ঃ—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"এ সংসার রসের কুটি—
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি।
ওরে যার যেমন মন, তার তেমন ধন, মন কররে পরিপাটি॥
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটি—
ওরে—ভাই বন্ধু দারা সুত, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি॥
জনকরাজা ঋষি ছিল তার কিছুতে ছিলনা ত্রুটী—
সে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেতে পেত দুধের বাটি॥
রমণীরে বিষ ভেবেছ তাতেও ত দেখিনা ত্রুটী—
তুমি ইচ্ছেসুখে ফেলে পাশা কাঁচিয়েছ পাকাঘুঁটি॥
মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া ভাবছ মায়ার বেড়া কাটি—
শ্যামের পদে অভেদ জেনো শ্যামামায়ের চরণ দুটি॥"

আজু গোঁসাইয়ের মুখে সর্ব্বদা এরূপে সত্য কথা শুনিয়া ঐ সৎসঙ্গ প্রভাবে রামপ্রসাদ সত্যানুসন্ধানে লুব্ধ হইয়া যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা রামপ্রসাদের গানেতেই প্রকাশ পায়। রামপ্রসাদের এই অবস্থার গান এই—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন দুচার ডুবে ধন না পেলে—
তুমি দম সামর্থে একডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর মূলে॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝারে মন শক্তিরূপা মুক্তা ফলে—
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে শিব যুক্তির মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভির আছে আহার লোভে সদাই চলে—
তুমি বিবেক হলদি গায় মেখে যাও ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে—
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন মিলবে রতন ফলে ফুলে॥"

সত্য মানুষের প্রতি নিষ্কপট ভক্তি না হইলে সত্যলাভ কঠিন ব্যাপার। রাস্তায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হয়। ধনীর আরাধনায় অমূল্য-ধন সহজেই লাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ভক্তিপথে খাড়া হইতে যোগের যাহার যতদূর প্রয়োজন, তাহা হইলেই সজ্জনগণ তাহা হইতে উঠাইয়া দিয়া থাকেন। আরো কারণ এই যে, কলিকালে কঠিন সাধন জীবের অনিষ্টজনক বলিয়াই এই সময় আজু গোঁসাই গাহিয়াছিলেনঃ—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"ডুবিস্‌নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম্ আট্‌কে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফো নাড়ি ডুব দিওনা বাড়া বাড়ি—
তোমার হলে পর জ্বর জাড়ি যেতে হবে যমের বাড়ি॥
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট মিছে কষ্ট কেন করি—
ও তুই ডুবিস্‌নে, ধরগে ভেসে, শ্যাম কি শ্যামার চরণ তরী॥"

এর পর রামপ্রসাদ ঠিক হইলেন। পরে গাহিয়াছেন ঃ—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি—
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি—
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে সোণাতে রং ধরায়েছি—
মণি মন্দির মেজে দিব মনে এ আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি—
এবার শ্যামার নামটী ব্রহ্ম জেনে ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম সব ছেড়েছি॥"

ইহাতে বুঝিলেনত—রামপ্রসাদ কি প্রকারের শাক্তধৰ্ম্মী ছিলেন!

প্রশ্ন=আচ্ছা রামকৃষ্ণ পরমহংসের কি রকম বলুন দেখি?

উত্তর = রামকৃষ্ণ পরমহংসের যে বাহ্যলুপ্ত অবস্থার কথা প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহাও সত্যের এক অঙ্গ—যোগেরই অবস্থা। পূর্ব্বে এই সত্য সনাতন ধর্ম্মের ন্যাসধর্ম্ম নামের প্রসঙ্গে, ইঁহাদের প্রবর্ত্তের সাধনের কথা এক সময়ে একটু বলিয়াছি। তাহাও এই যোগেরই কথা। রামকৃষ্ণ পরমহংসের এই বাহ্য লুপ্ত অবস্থা এবং তাঁহার মুখের উপদেশ শুনিয়া যে অবিদ্যার বিদ্যায় বহু বিজ্ঞজনেরও তাক লাগিয়াছে, এই গুণও তাঁহার এই সত্য সনাতন ধর্ম্ম-সুত্র হইতে লাভ হইয়াছিল।

বাইশ ফকিরের হাটের কথা একবার কথা-প্রসঙ্গে আপনার নিকট উল্লেখ করিয়াছি। সত্য সনাতন ধর্ম্মের এক হাট ঘোষপাড়াতে এক সময় বসিয়াছিল। সেই হাটে অবশ্য তিনি যোগ দেন নাই, কিন্তু সেখান হইতে যখন এই হাট ভাঙ্গিয়া অন্যত্রে চলিয়া গেল, তখন ভাঙ্গা হাটের চুটকি দোকানদার হইতে সত্যের কিছু তিনি খরিদ করিয়াছিলেন। এই ভাবে না হউক, ঘোষপাড়ার উল্লেখ তাঁহার জীবনীতে আছে দেখিতে পাইবেন। ইহাতেই তাঁহার এই অবস্থা। ইহা সত্যের খাট অবস্থা হইলেও জগতের পক্ষে অতি উচ্চ অবস্থা।

কলিকাতার জনৈক সজ্জন মুখে আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে, কলিকাতাতে এই সত্য সনাতন ধর্ম্মের বৈঠকে রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার আসিয়া তাঁহার নিজের বাহ্য লোপের অবস্থা জানাইয়াছিলেন। সজ্জন মহাজন তাঁহাকে এই অবস্থার অতীত করিয়া তুলিয়া আরো উত্তম লাভ করাইতে কৃপাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন যে "এও তোমার একটা রোগ, এদের সঙ্গ করিলে কিছুদিনেই তোমার এ রোগ

সারিয়া উত্তম হইবে।" তিনি এই সদুপদেশের মর্ম্ম না বুঝিয়া এই সঙ্গ ছাড়িয়া দিলেন; গতিকেই এতাধিক কিছু হইল না। যাহা হউক রামকৃষ্ণের যাহা কিছু গুণমাহাত্ম্য ছিল, এও সত্য সনাতন ধর্ম্মেরই জানিবেন। বর্ত্তমান লাভের সম্পর্ক যেখানে আছে, সেখানেই এ ধর্ম্মের সম্পর্ক আছে জানিবেন।"

বাইশ ফকিরের হাট

প্রশ্ন = এই যে আপনি বাইশ ফকিরের হাট বলেন, সত্য সনাতন ধর্ম্মের বৈঠক বলেন—এ সব কি? বাইশ ফকিরই বা কে, হাটই বা কি, বৈঠকই বা কাকে বলেন?

উত্তর = বৃন্দাবনের শ্রীদাম সুদামাদি দ্বাদশ গোপাল, ললিতা বিশাখাদি অষ্ট সখি এবং রাধাকৃষ্ণ এই বাইশ জনকে ইঁহারা বাইশ ফকির বলেন। এই সবের মিলনস্থলকেই হাট বা বৈঠক বলা হয়।

প্রশ্ন = যাঁহাদের নাম আপনি বলিলেন, ইঁহারা ত দ্বাপরে বৃন্দাবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কোথাও ঐ নামে কেহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ত কখনও শুনি নাই। কোন গ্রন্থে ত দেখা যায় না।

উত্তর = না, এই নামে জন্ম গ্রহণ করেন বটে কিন্তু ইঁহারা দ্বাপরের পরেও এই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন, তাহা কতক গ্রন্থেও আছে বৈ কি?

নবদ্বীপের কথা চৈতন্য মঙ্গলাদি গ্রন্থে আছে, তাহাতে দেখিবেন এই সবের উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী গদাধরকে শ্রীমতী, রামানন্দরায়কে বিশাখা সখি, নরহরিকে সখি মধুমতি, কলা কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতিকে দ্বাদশ গোপাল বলিয়া গ্রন্থাদিতে লিখিত হইয়াছে।

প্রশ্ন=আচ্ছা, বাইশ ফকিরের হাট বলিয়া আপনি যে সময়ের কথা বলেন, এই বাইশ ফকিরের নাম কি আপনি বলিতে পারেন?

উত্তর=লৌকিক নাম দিয়া জগতে এই পরিচয় দিতে ইঁহারা ইচ্ছা করেন না। তবে ইঁহাদের এসময়কার বৈঠকে সময় সময় কোন কোন প্রসঙ্গের মধ্যে কারো কারো নাম উঠিলে "ইনি বাইশ ফকিরের একজন" এরূপ কথা হইয়া থাকে। সব নামই একভাবে বাহিরে প্রকাশ হইয়াছে, তাহা আপনার জানা না থাকিলে জানাইতে পারি। তাই বলিতেছি, বাইশ ফকিরের হাট ঘোষ পাড়া হইতে অন্তর্দ্ধান হওয়ার পর ঘোষ পাড়াতে কর্ত্তাভজা বা শচীমার ধর্ম্ম নামে একটী বহির্ম্মুখ ধর্ম্ম এখনও ঘোষ পাড়াতে আছে। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক বহিতে অক্ষয় কুমার দত্ত এই কর্ত্তাভজা ধর্ম্মের বিষয় লিখিতে বাইশ ফকিরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অক্ষয় কুমার দত্ত বাইশ ফকিরের সত্য সনাতন ধর্ম্মমণ্ডলীর কোন কথা পান নাই বলিয়াই, ফকির ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকই সত্য নহে, তথাপি আপনি বাইশ ফকিরের নাম বারবার চান বলিয়া এই সূত্রে প্রচারিত নামগুলি আপনাকে জানাইয়া দিতেছি:—

৺অক্ষয় কুমার দত্তের প্রচারিত বাইশ ফকিরের নাম :—

১।	হটুঘোষ।	১২।	নিতাই ঘোষ।
২।	বেঁচু ঘোষ।	১৩।	আনন্দরাম।
৩।	রামশরণ পাল।	১৪।	মনোহর দাস।
৪।	নয়ন।	১৫।	বিষ্ণুদাস।
৫।	লক্ষ্মীকান্ত।	১৬।	কিনু।
৬।	নিত্যানন্দ দাস।	১৭।	গোবিন্দ।
৭।	খেলারাম উদাসীন।	১৮।	শ্যাম কাঁসারী।
৮।	কৃষ্ণদাস।	১৯।	ভীম রায় রজপুত।
৯।	হরিঘোষ।	২০।	পাঁচু রুইদাস।
১০।	কানাই ঘোষ।	২১।	নিধিরাম ঘোষ।
১১।	শঙ্কর।	২২।	শিশুরাম।

আর একখানা হাতের লিখা বহিতে বাইশ ফকিরের নাম এক জায়গায় পাইয়াছিলাম, সেই নামগুলিও প্রায় সবই এক, তবে কিছু ভিন্ন আছে বলিয়া পৃথক করিয়া আবার বলিতেছি :—

জগদীশপুর নিবাসী	১।	বেঁচু ঘোষ।
” ”	২।	শিশুরাম।
” ”	৩।	শঙ্কর।
” ”	৪।	কানাই।
” ”	৫।	নিতাই।
” ”	৬।	হরি।

জগদীশপুর নিবাসী	৭। পাঁচকড়ি।
” ”	৮। নিধিরাম।
যশোহর নিবাসী	৯। বড়রাম নাথ দাস।
” ”	১০। আন্দিরাম।
” ”	১১। নিত্যানন্দ।
” ”	১২। নয়ান।
” ”	১৩। লক্ষ্মীকান্ত।
” ”	১৪। দেদু কৃষ্ণ।
” ”	১৫। গোদা কৃষ্ণ।
” ”	১৬। বিষ্ণু দাস।
” ”	১৭। কিনু।
” ”	১৮। গোবিন্দ।
” ”	১৯। হটু ঘোষ।
” ”	২০। মনোহর দাস।
ভূদ্রকুমার নিবাসী	২১। শ্যাম।
” ”	২২। ভীম রায়।

সত্য সনাতন ধর্ম্মের বর্ত্তমান বৈঠক হইতে আমরা ২২ জনের লৌকিক নাম সব শুনি নাই। প্রসঙ্গ স্থলে যে কয়টী নাম মধ্যে মধ্যে শুনা যায়, ইহা ৺অক্ষয় কুমার দত্তের প্রচারিত নাম মধ্যে সবই আছে। আর অন্য হাতের লিখা বহি হইতে যে নাম সংগৃহীত বলিয়া বলিলাম, ইহাতে আমাদের শুনা একটী নাম অর্থাৎ ৺রামশরণ পাল মহাশয়ের নাম নাই।

এই ত বাইশ ফকিরের নাম সম্বন্ধে সব বলিলাম, এই সকল সজ্জন যখন যে স্থানে উদয় হন, সেই স্থানেই তাঁহাদের হাট বলিয়া বলা হয়। কেবল এই বাইশ জনের মিলনই যে হাট, এমনও নহে। এই সকল সজ্জনগণের অপরাপর আরো অনুসঙ্গী, সঙ্গী সহ মিলনকে বৈঠক বা হাট বলা যায়।

কর্ত্তা ভজা
বা
শচী মায়ের ধর্ম্ম।

প্রশ্ন=শচী মায়ের ধর্ম্ম কি? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের মাতা যে শচী, সেই শচী দেবীর কোন ধর্ম্ম নাকি?

উত্তর=না, না এই যে বাইশ ফকিরের নাম বলিলাম, ইহার মধ্যে ঘোষপাড়া নিবাসী রামশরণ পাল নামে একজন ছিলেন। ঐ রামশরণ পালের স্ত্রীর নাম শচী। রামশরণ পালের বাড়ীতেই ফকির ঠাকুর থাকিতেন। তাঁহাদের দেহ ছাড়ার পর, শচী হইতে বহির্ভাবের এক ধর্ম্ম, কর্ত্তাভজা নামে চলিতেছে। ঐ কর্ত্তা ভজা সম্প্রদায়ই শচীমার ধর্ম্ম বলিয়াও বলেন। রামশরণ পালের বাড়ীতে ফকির ঠাকুরের গায়ের ছেড়া কাঁথা ছিল, ইহা নানা সাজে সজ্জিত করিয়া রাখিয়া শচী, ইহাতে পূজা নমস্কার করিয়া

মানসিক আদায় করিতেন, এবং একটী ডালিম গাছের নীচে ফকির ঠাকুর হাত পা ধৌত ও আচমনাদি কার্য্য করিতেন, রোগ সারা, ছেলে হওয়া ইত্যাদি নানা প্রকার ঐহিক মানস সিদ্ধি হইবে বলিয়া ঐ ডালিম তলার মাটী খুঁড়িয়া লোককে দেওয়া হইত। অমূলক অনিত্য বাসনাময় ভ্রান্ত জীব, অসার কামনায় ইহা লইয়াই ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছে মনে ভাবিয়া শচী মার ধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্ম সৃষ্টি করিল। বাউল, নেড়া নেড়ী, কিশোরী ভজার ন্যায়, কর্ত্তাভজা নামেও ঐ একটী হইল। এখনও বৎসর বৎসর দোলের সময় ঐ দলের অনেক লোক সেখানে যায়, সেই স্থানে মহাসমারোহ হয়। তথায় গিয়া পূজা বার্ষিক মানসিক আদায় করে, ঐ উপায়ে শচীর নামে এখনও বহুতর টাকা আমদানি হইতেছে। এসব নেড়া নেড়ীর হাটের রকম-ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া কলিকাতার বৈঠক হইতে গান হইয়াছিল ঃ—

রাগিণী মিশ্র—তাল একতালা।

"গোল মালে মাল লুটবে বলে হাটের নেড়া,
থাকে না কেউ আর হুজুক ছাড়া॥
বিনে ঘরের বাদি জয়, মনে কল্লে কিত: হয়,
সেত নয় ডালিম তলা খোঁড়া॥
দিয়ে রাঁড়ী ভুড়ি ফাঁকি, বাহির কত্তে চাকি,
সর্ব্বক্ষণই দেখি, দিচ্ছে তাড়া॥

বলে রাঁড়ী চরকা তোল, কি আছে তা খোল,
এল রাস দোল হগে খাড়া ॥
যদি না থাকে কর ধার, এমন কর্ণধার,
কোথা পাবি আর ইহার বাড়া ॥
অঙ্গ স্পর্শ করলে তোর. ঘুচবে মনের ঘোর,
দেখবি সুখ সাগর খাড়া খাড়া ॥
শুধু দোহাই দিয়ে বাবু, মানুষ করে কাবু,
বুঝেনাক তবু নেড়ী নেড়া ॥
দিয়ে টাকা কড়ি ঘুস. কুটিয়ে আনে তুঁষ.
এমনি বেহুঁস মানুষ ভেড়া ॥
মানুষ মানুষের বন্ধু, প্রেমামৃত সিন্ধু,
বিন্দু বিন্দু তাবে জগৎ জোড়া ॥
রসের রসিক জনে কয়, কথা মিথ্যা নয়.
গাড়ায় কোথা পায় রসের গোড়া ॥”

রামশরণ পাল মহাশয় দেহ রাখার সময় ঐ শচী, পাল মহাশয়ের দেহান্তে কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইলেন। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অর্থের প্রয়োজন. পাল মহাশয়ের দেহান্ত হইলে অর্থাগমের উপায় কি হইবে ভাবিয়া আকুল হইয়া পাল মহাশয়ের কাছে কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে বলিতে লাগিলেন “তুমি ত চলিলে, আমার কি উপায় হইবে?” পাল মহাশয় ইহাতে বলিলেন “এ্যাঁ! সামান্য অর্থের জন্য এত ব্যাকুল হয়েছিস্, মানুষ চাহিলি না! টাকা!! টাকা তোর পায়ে ফলবে—তোর টাকা

ভুতে যোগাবে।" সতের বাক্য অব্যর্থ। এই শচীর নামে এখনও এইরূপে কত টাকা যে ভুতে যোগাইতেছে, তাহা আর কি বলিব। দুঃখের বিষয় যাঁহার বাক্যে এত কিছু হইয়া যাইতেছে, তাঁহাকে তাহারা চিনিয়া লইতে পারিল না।

প্রশ্ন = আচ্ছা, ফকির ঠাকুর আপনারা কাকে বলেন ?

উত্তর = ফকির ঠাকুর কে আপনি জানিতে চান ! বলুন ত আপনি কে ? এইত আপনি সর্ব্বদাই বলিতেছেন—আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ছাতি, আমার ধুতি, আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার জ্ঞান, সব ত আমার— বলুন ত আমি কে ? আমি কেমন জিনিষ তাকি জানেন ?

"আপনাকে না জানে জীব পরকে জান্তে চায়রে।
কাঠের পুত্তলি সম কুহকে নাচায় রে ॥"

আপনার এ প্রশ্নের উত্তর সর্ব্বত্র প্রকাশ যোগ্য নয়, তবে প্রসঙ্গে সঙ্গে যে কথা আসে, তাহা কোন ভাবে প্রকাশ না করিয়াও পারা যায় না, তাই বলিতেছি :—

শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ৯ম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য প্রকাশ আছে :

"অব জানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীংতনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥"

অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, আমি মানব শরীর অবলম্বন করিয়াছি বলিয়া মূর্খ লোকে আমার পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে না পারিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

সত্য সনাতন ধর্ম্ম।

ফকির ঠাকুর কাকে বলি শুনিয়া কি হইবে? আশ্রিত বিনা যাঁহাকে দেখিয়াও কেহ বিশ্বাস করেন না, তাঁহার কথা শুনিয়া কাজ কি? যাক্—উত্তর কথা আপনার বলিয়া যাইতেছি। ইহাও এক কথাই শুনিয়া লউন। এই ফকির ঠাকুরই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।

প্রশ্ন=ফকির ঠাকুর বলেন কেন?

উত্তর=তিনি সেখানে, ছেড়া কাঁথা গায় সাধারণ রাস্তার ভিখারী ফকির বেশে নিত্য সঙ্গীদের কাছে ধরা পড়িয়া ছিলেন। বাহিরের লোক ঐ বেশ দেখিয়া তাঁহাকে ফকির ডাকিত। তাঁহার সঙ্গীগণ ফকির ঠাকুর বলিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা যা ডাকেন, তাহাই সুন্দর। আত্মতত্ত্ব বিহীন জন, মানুষ পরিচয় করিতে অক্ষম। স্বরূপ পরিচয় না করিয়া আনুমানিক মান্যও কোন কাজে লাগে না বরং একে আর হইয়া বিরূপই হয়। ঐ শচীমার ধর্ম্মীগণও ফকির ঠাকুরের দেহ রাখার পর ঠাকুরের মহিমা লোকমুখে শুনিয়া আনুমানিক গুণ মহিমা বিশ্বাসে পূজা বার্ষিক মানসিক আদায় করেন। ৺রামশরণ পালের পুত্র দুলালের বৈঠকের গান ও প্রসঙ্গের ছিবড়া লইয়া ইহাদের নিজের কাল্পনিক কারবার চলিতেছে। সেই সব গান ও প্রসঙ্গে—অনন্ত জগতের কর্ত্তা, নিত্য মানুষই ভজনীয় শুনিয়া, সত্য নিত্য পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কর্ত্তাকে পরিচয় না করিয়া, সাধারণ জীব স্বয়ং কর্ত্তা সাজিয়া, আত্ম স্বার্থ ভজনের ছড়াছড়ি জুড়িয়া কেবল লোকের

নিকট পরিচয় জন্য সুন্দর সুন্দর নাম---কর্ত্তা ভক্তা ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

অন্ধকারময় ছায়াকে সূর্য্য বলা যেমন অপরিসীম ভুল, জীবকে ভগবান বা ভজনীয় কর্ত্তা বলা তেমনি ভুল। জন্ম অন্ধ কখনও সূর্য্য দেখে নাই, সূর্য্যের জ্যোতি দেখে নাই। সূর্য্যের জ্যোতিতে আবরণ পড়িয়া যে ঘোর অন্ধকারময় ছায়া সৃষ্টি হয়—তাহাও প্রত্যক্ষ করে নাই। জন্ম অন্ধ, অন্ধকারময় ছায়া কি, বুঝিতে চাহিয়া—লোক মুখে শুনিতে পাইল, জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের জ্যোতিতে আবরণ পড়িয়া অন্ধকারময় ছায়া সৃষ্টি হইয়াছে। ছায়া অন্য কিছু নয়, আবরণ ঘুচিলেই যে সূর্য্যের অভেদ জ্যোতির সঙ্গে মিশিয়া যায়, আর অন্ধকার রূপ থাকে না। ইহা শুনিয়া অন্ধ, অন্ধের নিকট ব্যাখ্যা আরম্ভ করিল, এই যে আঁধার দেখছ—ইহাই সূর্য্য। ইহা শুনিয়া যেমন জগতের চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের হাসি পায়—রাগ ধরে, জীবকে ভগবান বা ভজনীয় কর্ত্তা বলিয়া কথা শুনিলে, দিব্য চক্ষুষ্মান সজ্জনগণেরও তেমনি অন্তরে ব্যথা জন্মে।

নবদ্বীপে মুরারী গুপ্ত সত্য অবগতির পূর্ব্বে, একদিন নিজ-ভ্রান্তি ভজনে কয়েক জনের নিকটে বসিয়া হাত মুখ মাথা নাড়িয়া জীবে ভগবানে অভেদ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, এবং এই সম্বন্ধে সদুপদেশ দেওয়ার জন্য মুরারী গুপ্তের খাওয়ার সময় তাহার থালে মুতিতে মুতিতে বলিয়াছিলেন :—

"জীব আর ভগবানে অভেদ যেবা করে।
প্রস্রাব করি আমি তার থালার উপরে॥"

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের আদি খণ্ডে এই ঘটনাটী—"মুরারী গুপ্তকে প্রভু কি করিয়াছিলেন ও কি উপদেশ দিয়াছিলেন—লিখিত আছে। একটু শুনুন:—

"ত্বরস্ত না হয়ো তুমি, এইখানে আছি আমি,
ভোজন করহ বাণী কৈল।
মধ্য ভোজন বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা,
থাল ভরি মুত মুতিল॥
কি কি বলি ছি ছি করি, উঠিলা সে মুরারী,
করতালী দিয়া গেলা গোরা।
কর শির নাড়িয়া, ভক্তি পথ ছাড়িয়া,
যোগবলে এই এই অভিপাড়া॥
জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষিয়া, কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া,
রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ।
ভৌতিকে তাহার দৃষ্টি, এ নহে ভজন পুষ্টি,
নাহি বুঝ বুদ্ধি অতি মন্দ॥
পরম দয়ালু হরি, তেঁহো সর্ব্ব শক্তিধারী,
জীবেতে সম্ভবে একি কথা।
তেঁহো ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর জীবন ধন,
না বুঝিয়া কেনে দেহ ব্যথা॥"

মানুষ-ভজন, গুরু-ভজন ইত্যাদি সাধুবাক্য ও সাধু শাস্ত্র শুনিয়া কত ক্ষুদ্র জীব যে কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়াছে, তাহা কত বলিব। আজ কাল কেবল সুমধুর নামে নামী হইতে সকলেই ইচ্ছুক। কাজের বেলা কিছুই নয়। কাজের খবর কেহই করিতে চায় না। আপনাকে আপনি চিনি না, কর্ত্তা চিনিব কিরূপে? কর্ত্তা চিনি না—কর্ত্তা-ভজা নামে কি ফল! সেই অনন্ত জগতের কর্ত্তা মহাপ্রভু কোথায়—কে তাহার খবর করে?

মহাপ্রভু
লুকালেন কি রকম?

প্রশ্ন=শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু লুকাইয়াছেন বলিয়া আপনি বলিয়াছেন। গ্রন্থাদিতে ত তাহা কিছু দেখি না, লোক মুখে শুনা যায়। কেহ বলে—সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, কেহ বলে—গোপীনাথ মন্দিরে ঢুকিয়া গোপীনাথ মূর্ত্তিতে মিশিয়া গেলেন। সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার কথা আর গোপীনাথ অঙ্গে মিলনের কথা লোকে বলে কেন? আর আপনি যে তিনি লুকালেন—কথা বলেন, সেই বা কি রকম?

উত্তর=পূর্ব্বে যে একবার বলিয়াছি, তিনি অদ্বৈত গোঁসাইর "হাটে

না বিকাল চাউল" সংবাদ পাইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। ঐ ব্যাকুলতায় উন্মত্ত হইয়া তিনি একবার সমুদ্রেও ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাহাতে জেলেগণ তাঁহাকে সমুদ্র হইতে তুলিয়াছিল। ইহা গ্রন্থাদিতে বিস্তারভাবে লিখিত আছে। এই স্থলে অধিক বলার প্রয়োজন নাই। তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রে ঝাঁপের কথা বলে, কিন্তু তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া দেহ ছাড়েন নাই। গোপীনাথের অঙ্গে মিশার কথা যে বলে, ইহারও কারণ আছে। অদ্বৈতের সংবাদে ব্যাকুলতার সময় তিনি গোপীনাথের মন্দিরের সাক্ষাৎ বহুলোককে লইয়া কীর্ত্তনে ছিলেন। তাহাতেও দেখিলেন—সকলে কেবল বাহ্য লইয়া গোল করিতেছে—হাটে চাউল বিকায় না। তাহাতেই এদের ছাড়িয়া গোপীনাথের মন্দিরে ঢুকিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে সকলেই তাঁহাকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। গোপীনাথের মন্দিরে ঢুকিতে অনেকেই দেখিয়াছিল, তাই খুঁজিতে মন্দিরে ঢুকিল। সেখানে গিয়া দেখিল, গোপীনাথ মূর্ত্তির কাছে কেবলমাত্র একজন জোটে চাঁপদেড়ে মানুষ। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের প্রভুকে কি দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন "হিঁয়া আউর কই নেহিহে, খালি হাম হে"। তাহাতে তাহারা খুঁজনের চেষ্টা ছাড়িয়া কেহ কেহ মনে করিল, তিনি গোপীনাথের অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন।

তিনিই কিন্তু বেশভূষা ছেড়ে জোটে চাঁপদেড়ে সেজে, তখনও ঘরে ছিলেন, পরে ঐ বেশে এ সবের সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। সজ্জন সমাজে এখনও পূর্ব্ব রচিত গান গাওয়া হয়।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

"আগে মন করনি যতন হারাধন পাবে কার কাছে।
এড়ে কি ধরা যায় তেড়ে সে গুড়ে বালি পড়েছে॥
মস্তকে রেখে সে মণি, পরমাত্মা স্বরূপিণী,
সুসুপ্ত করিয়া ফণি, সে ধনী নিদ্রিত আছে।
সুমেরু গহ্বরে ফণি, কে জাগাবে কাল সাপিনী,
বিনে সজাগ কুণ্ডলিনী, যা ভাব সকলি মিছে॥
কে আর সম্ভবে জ্ঞানী, কীট পতঙ্গ আদি প্রাণী,
ফণীন্দ্র মণীন্দ্র মণি, ঊর্দ্ধ মধ্য আর নীচে;
ত্রিদেব হইয়ে দৈন্য, ত্রিলোক দেখিছে শূন্য,
জীবে কি সম্ভবে গণ্য, সচৈতন্য কে আর আছে॥
কে বটে জোটে চাঁপদেড়ে, না চিনে দিয়েছ ছেড়ে,
কপাল গিয়েছে পুড়ে, মণি কি আর মিলে কাচে।
ভ্রমিছ কি উড়ে উড়ে, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল বেড়ে,
হারিয়ে শিঙ্গে শুধু ফুঁ পেড়ে, দুধের সাধ কি ঘোলে ঘুচে॥

প্রশ্ন=এরপর তিনি কোথায় গেলেন?

উত্তর=এরপর তিনি রাস্তা, ঘাটে, পথে আপথে, এদিকে, সে দিকে একক ঘুরিতে লাগিলেন। দেখিতে লাগিলেন—অমূল্যধনের সত্য-পিপাসিত হইয়া কোন জীব তাঁহার কাছে আসে কি না। অনেক দিন এরূপে ঘুরিলেন, দেখিলেন কেহই পিপাসিত অন্তরে তাঁহার কাছে আসিতেছে না। এ রকমে একদিন তিনি নদীর পার দিয়া ঘুরিতেছেন, ঐ সময়ে এক সদাগর নৌকায় মাল বোঝাই দিয়া

ব্যবসা করিতে নদী দিয়া চলিয়াছে। তিনি পার হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগো সওদাগর, তোমার নৌকায় কি বোঝাই?" সওদাগর তাহার নৌকায় যে মাল ছিল, তাহারই কথা বলিল। কতক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগো সওদাগর, তোমার নৌকায় কি বোঝাই?" সেও পূর্ব্ববৎই উত্তর দিল। তৎপর আবার তিনি ডাকিতে ডাকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগো সওদাগর, তোমার নৌকায় কি বোঝাই করিয়া চলিয়াছ?" বার বার একই প্রশ্ন করায় সওদাগর বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল: "লতাপাতা বোঝাই"। তিনি তখন বলিলেন "আচ্ছা বেশ"। ইহাতে তাহার নৌকার মাল সবই লতাপাতা হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া এই মনুষ্যটী সামান্য নয় ভাবিয়া নৌকা রাখিয়া, সওদাগর তাঁহার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িল, আর বলিতে লাগিল, "আপনি কে বলুন, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমাকে রক্ষা করুন।"

রক্ষা করুন বলিতে, জীবের পক্ষে যে অতি উত্তম রক্ষা, সে তাহা চাহিল না। চাহিল কেবল তাহার নৌকার মাল যে লতা পাতা হইয়া ক্ষতি হইয়াছে, এই ক্ষতি সারিয়া দিতে। এই প্রার্থনায় সে নানা প্রকার ব[illegible], অনুনয়, বিনয়, নমস্কার করিয়া পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং পরিচয় চাহিলে তিনি বলিলেন "তুই যাঁহার পরিচয় চাস, তিনি সত্য নারায়ণ জানিবি।"

এই কথা শুনিয়া "বাবা, সত্য নারায়ণ, বাবা সত্য নারায়ণ, আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন, বলিয়া কান্দিতে লাগিল,

আর বলিতে লাগিল "তোমার কাছে আমার অপরাধ হওয়ায় আমার নৌকার মাল সব লতা পাতা হইয়া গিয়াছে, আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। বাবা সত্য নারায়ণ, তুমি কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মুক্ত করতঃ আমার নৌকার মাল সব পূর্ব্ববৎ করিয়া দিয়া রক্ষা কর।" তিনি বলিলেন "এই মাত্র তুই চাস, অন্য কিছু নয়। যা—যা! তবে সত্য নারায়ণের পূজা দিস্, তোর নৌকায় যে মাল ছিল সেই মালই হইবে।" সওদাগর জিজ্ঞাসা করিল সত্য নারায়ণের পূজার বিধি কিরূপ? ভ্রান্ত সওদাগর বুঝিল না কার কাছে আসিয়াছে, কার পূজা কি ভাবে করিতে চাহিতেছে। বাসনাময় অন্তরে ব্যাকুল হইয়া পূজার বিধি চাহিতেছে, সত্যানুরাগ ইহার কিছুই নাই দেখিয়া—অথচ দূরে থাকিয়া কাল্পনিক পূজাই করিতে চায় বলিয়া—প্রভু বৈধ নিয়মে সত্য নারায়ণের পূজার এক বিধি বলিয়া দিলেন। ভ্রান্ত সওদাগর ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। দূরে থাকিয়া বাহ্য পূজাতে সামান্য স্বার্থ উদ্ধার করিয়া স্থির হইয়া রহিল। অধিক আর কিছুই চাহিল না।

এইরূপে তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে এক দিন, এক ব্রাহ্মণ তাঁহার ফকির বেশ দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই ফকিরটী—দেখিতে,—হাব ভাবে,—চেহারায়, বড়ই তেজস্বী বোধ হইতেছে। ইহার কাছে অবশ্য কোন গুণ আছে। ইহার কাছে কিছু চাহিলে হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। ঐহিক বাসনাময় ভবকূপে পতিত ব্রাহ্মণ, তাহার ঐহিক নানা কামনা সিদ্ধি মনস্থে, তাঁহাকে নানারূপ কাকুতি মিনতিতে জড়াইয়া ধরিল। পূর্ব্ব কথিত সওদাগরের ন্যায়

এই ব্যক্তির সেইরূপ ক্ষুদ্র বাসনাময় ব্যগ্রতা দেখিয়া প্রভু বলিলেন. "যা সত্যপীরের পূজা দিস্, তোর সব কামনা সিদ্ধ হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিল "সত্যপীর কে?" তিনি বলিলেন "তুমি যাহার কাছে প্রার্থনা করিতেছ—সেই সত্যপীর।" অভিমানী ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "আমি ব্রাহ্মণ, আমি পীরের পূজা করিব কিরূপে? তা হলে লোকে আমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবে।" তিনি বলিলেন "সত্য নারায়ণের সেবা করিতে পারিস্ ত? যেই সত্যপীর—সেই সত্য নারায়ণ।" ব্রাহ্মণের আবার প্রশ্ন উঠিল. পীর—নারায়ণ হবেন কিরূপে? প্রভু অমনি বলিলেন "কিরূপে? দেখতে চাস্ ত এই দেখ" বলিয়া তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্য রূপে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে সাক্ষাৎ দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ পায়ে পড়িল, কিন্তু তথাপি দুর্ভাগার কুমতি গেল না। এমন দর্শন সাক্ষাৎ দেখিয়াও তাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিত্য সত্য অমূল্য ধন মানুষ রতন কিনিতে পারিল না, ঐহিক বাসনা ছাড়িল না। ঐহিক কামনা সিদ্ধির জন্যই ব্যাকুল হইয়া পায়ে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। ইহাতেও দেখিলেন সত্য লাভের পিপাসা নাই। এও কেবল অসার ধন কামনায় সত্য নারায়ণের পূজার নিয়ম বিধি চাওয়ায় সেই রকম নিয়ম বিধি শুনালেন। ইহাতেই এই ব্রাহ্মণও সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। এই সব ঘটনা সত্য নারায়ণের পুঁথিতেও আছে। সত্য নারায়ণের মূল সত্যতত্ত্ব না জানিয়া লিখায় পুঁথিতে সব নাই বটে, অথচ লিখাতে গোল আছে, কিন্তু ঘটনা বহিতেও দেখা যায়।

এইরূপে তিনি তাঁহার কোল প্রার্থী কেহ আছে কি—না, খুঁজিয়া নানা স্থানে অনেক দিন একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রশ্ন=সকলকে ছাড়িয়া তিনি লুকাইয়া একা বেড়াইলেন, তবে নিত্য সঙ্গী বলেন কাকে? সঙ্গীগণকে যদি ছাড়িয়া গেলেন, তবে নিজ সঙ্গী কি রকম?

উত্তর=নিত্য সঙ্গীর সঙ্গে তাঁহার নিত্য মিলন নিত্যই থাকে। তাহা কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না। নিত্য সঙ্গীদের উদয় স্থানই—বৃন্দাবন। প্রভু বাক্যে প্রকাশ আছে ঃ—

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া আমি এক পদও সরি না। কিন্তু বহির্ম্মিলনে সময় সময় কার্য্য কারণে বিচ্ছেদ হয়। নিত্য সঙ্গীগণের নিত্য সঙ্গে থাকিয়াও এই প্রকার বিচ্ছেদ সময় সময় হইয়া থাকে। যেমন বৃন্দাবন হইতে মথুরায় যাওয়ায় ব্রজবাসী-দের হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রেমসুখের গাঢ়তার জন্যই এই বিচ্ছেদ, এ ছাড়া ছাড়ি নয়, ইহা প্রেম পোষক খেলা। যাক এসব জ্ঞান বুদ্ধিতে বুঝিবার নয়। গ্রন্থাদি পাঠ ও শ্রবণে অবশ্য উদ্ধবের বিষয় জানেন, উদ্ধব সাধনে আত্মতত্ত্ব সম্পন্ন হইয়াও এই মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্রজবাসীদের নিকট যোগতত্ত্ব বেচিতে গিয়াছিলেন। উদ্ধবের মুখে—যোগ দ্বারা নিত্য মিলন থাকিবে উপদেশ শুনিয়া, ব্রজবাসীগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "উদ্ধব! তুমি ছেলে মানুষ, কৃষ্ণ প্রেমের বালক, তুমি বুঝিবে না আমরা ব্যাকুল কেন? তুমি যে যোগের উপদেশ দিতেছ, এ যোগ আমাদের কখনও বিয়োগ হয়

না। ইহা আমাদের নিত্যই আছে, ছাড়িলেও ছাড়ে না” নিত্য সঙ্গীদের এই নিত্য মিলনের বিষয় আপনাকে কি করে বুঝাব। এই রসের খেলা যাদের সঙ্গে হয়, তাহারাই মাত্র ইহা জানেন। নিত্য সঙ্গী রসিক ভক্ত ব্যতীত এই মর্ম্ম কাহারও বোধ হইবার নয়।

ভক্ত সঙ্গে রসের খেলা ও জীব উদ্ধার দুইটী কাজই তাঁহার। দ্বাপরে যেমন ভূভার হরণ কার্য্য—কংস বধ জন্য বৃন্দাবনের রসের খেলা ভঙ্গ করিয়া মথুরায় গিয়াছিলেন। এই স্থানে জীব উদ্ধার জন্য ব্যাকুল হইয়া রসের খেলার হাট ভাঙ্গাপড়িল। এই ভাঙ্গাও—নিত্য সঙ্গীগণ লইয়া নব্য ভাবে রসের হাট জুড়িবার জন্য।

প্রশ্ন = নিত্য সঙ্গীগণ এই অবস্থায় কি করিলেন ?

উত্তর = সঙ্গীগণ তাঁহাকে হৃদয়ে লইয়া, তাঁহার সুধাময় চন্দ্র বদন খানি খুঁজিতে লাগিলেন। যাঁহাদের দেহ ছাড়ার সময় হইয়াছিল, তাঁহারা দেহ ছাড়িয়া প্রভুর আকর্ষণে প্রভুসঙ্গে মিলন প্রতীক্ষায় যথা স্থানে পৌহুঁছিয়া নূতন দেহ ধারণ করিয়া রহিলেন।

প্রশ্ন = এই দেহেতে কি কারো সঙ্গে মিলন হইল না ?

উত্তর = হঁা—হইয়াছিল।

প্রশ্ন = এইরূপে মিলন কিরূপে কাহার সহিত ঘটিল বলুন দেখি ?

উত্তর = ঘুরিতে ঘুরিতে তিনে একসময়ে আকবর বাদসাহের দরবারে উপস্থিত হইলেন। আকবর বাদসার কতকটা সত্যের পিপাসা আছে দেখিয়া তাহার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইলেন। তাহাকে আপন করিয়া লওয়ার জন্য তাহার রাজকার্য্যের কর্ম্মচারী স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া বাদসার ওখানে রহিলেন। সেখানে তিনি তাঁহার নাম

বলিলেন—সনাতন। তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কাজ কর্ম্ম যথা নিয়মে নিজের আহারাদি প্রস্তুত সম্বন্ধীয় সব কাজ নিজ হাতে করতঃ অতি সাধারণ ভাবে সেখানে থাকিয়া ফাঁকে ফাঁকে সময় মত আকবর বাদসার নিকট বসিয়া সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। আকবর বাদসাহও তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। এই ভাবে কতক দিন চলিতেছে, এমন সময় নিত্যানন্দ তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি সনাতন নামে পরিচিত হইয়া এখানে আছেন। তিনি লুকাইয়া ভিন্নরূপ ধরিয়াছেন দেখিয়া, নিত্যানন্দও ভিন্ন রূপ ধরিলেন। নিত্যানন্দ মেয়ে লোকের কাপড় পরিয়া মেয়ে লোক সাজিয়া একটু আড়ালে আড়ালে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ দেখিলেন রন্ধনাদি কাজ কর্ম্ম তিনি নিজ হাতে সম্পন্ন করিতে বড়ই কষ্ট করেন, তাই নিত্যানন্দ ঐ মেয়েলোক বেশে যথা সময়ে তাঁহার বাসঘরের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এসব ব্যবহার দেখিয়া বলিলেন "তুমি কেগো, তোমার নাম কি, কেনই বা তুমি আমার এসব কাজ কর্ম্ম করিয়া দিতেছ ?" মেয়ে বেশ ধারী নিত্যানন্দ বলিলেন ঃ— "ওগো, আমার আর সংসারে আমার বলিতে কেহ নাই, আমার নাম সোণাদাসী। তুমি কাজ কর্ম্ম করিয়া বাসায় আসিয়া আবার এসব কাজ নিজে করিয়া বড় কষ্ট কর, আমি তোমারই দাসী হইয়া থাকিব, তাই তোমার এসব কাজ করিতেছি। আমার আর কোথাও যাওয়ার স্থান নাই, আমার কেহ নাই, তুমি যদি

কৃপা করিয়া ইহাতে কোন আপত্য না কর তবেই স্থান পাই। প্রভু তখন ও নিত্যানন্দের পরিচয় করেন নাই। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, বেশ, থাক।" এইরূপে নিত্যানন্দ সেখানে থাকিয়া প্রভূর সেবা কার্য্য করিতে থাকেন।

কতক দিন পর এক দিন বাদসা সনাতনের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সনাতনকে বলিলেন "আপনার কার্য্যে আমি বড়ই তুষ্ট হইয়াছি, আমি এই জন্য একটী পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি, আপনি আপনার ইচ্ছামত একটী জিনিষ যা চাহিবেন তাহা আমি দিব। আপনি কি চান বলুন তিনি বলিলেন "আমার কিছুরই আবশ্যক নাই, আমার অনায়াসেই সব চলিতেছে, পুরস্কারের আমার কোন প্রয়োজন নাই"। তবু বাদসা পুরস্কার দিতে বার বার পীড়াপীড়ি করিলে তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িল যে—"আমার এখানেত একটী মেয়ে লোক আছে, সেত আমার কাজ কর্ম্ম নিঃস্বার্থে করিয়া দিতেছে, তাহাকে ত আমি কিছু কখনও দিই নাই, তবে এই সুবিধায় তাঁহাকেই একটী জিনিষ দিয়া দিই।"

তাই বলিলেন "আমার এখানে একটী মেয়ে লোক থাকিয়া আমার রন্ধনাদি কার্য্য করে, যদি একান্ত আপনার পুরস্কার দেওবার মনস্থ হইয়া থাকে, তবে তাহাকে একখানি কাপড় দিতে পারেন। বাদসার দানের পক্ষে কাপড় একখানা অতি সামান্য বস্তু, তাই যতদূর বেশী মূল্যে পারেন, একখানা ভাল কাপড় পুরস্কার স্বরূপে দিলেন। তিনি এই বস্ত্র খানা লইয়া ঘরে গেলেন, গিয়া সোণা দাসীকে বলিলেন—"ওগো, আজ বাদসা সন্তুষ্ট হইয়া এই কাপড় খানা দিয়াছেন, ইহা নেও—তুমি পরিধান করিও।"

সোণাদাসী নম্রভাবে অতি আনন্দের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়া ঘরে যথা স্থানে রাখিলেন। পরে সোণাদাসী তাঁহাকে আহারে বসাইয়া অন্য দিনের ন্যায় অতি যত্ন সহকারে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতেছেন, অন্ন ব্যঞ্জন সেবা শেষ হইয়া আসিলে দুগ্ধ দিবেন, এমন সময় দেখিলেন—দুধ ঠাণ্ডা হইয়া রহিয়াছে। তাই তাড়াতাড়ি দুধ গরম করিয়া দিতে উনুনে বসাইলেন, কিন্তু আগুন ধরাইবার চেষ্টা করেন, এমন পাতলা লাকড়ি অভাবে আগুন কিছুতেই ধরিতেছে না। এদিকে দেখিলেন—তিনি ব্যঞ্জন আহার শেষ করিয়া দুগ্ধের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া আর সহিতে পারিলেন না, অমনি তাড়াতাড়ি আগুন ধরাইয়া দুধ গরম করিবার জন্য দৌড়িয়া সেই বহু মূল্য বস্ত্র খানা আনিয়া ছড়্ ছড়্ করিয়া মুহুর্ত্ত মধ্যে ছিঁড়িয়া উনুনে দিয়া আগুন ধরাইয়া দিলেন। প্রভু এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিলেন, এ সোণাদাসীত সাধারণ মানুষ নন। অমনি গিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"তুমি কে গো?" সোণাদাসী নামধারী নিত্যানন্দ প্রেমাশ্রু বর্ষিত নয়নে গদগদ স্বরে বলিলেন—"প্রভু, আমি তোমারই দাসী।" পরস্পর মুখের দিকে চাওয়া চাওয়ি হওয়া মাত্রই চিনিতে পারিয়া "ও তুমি ভাই নিত্যানন্দ, আর কার এমন ব্যবহার হইবে?" এই বলিয়া বুকে বুকে মিশাইয়া উভয় উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া মিলন সুখে পরস্পর প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন। পরে উভয়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। প্রভু বলিলেন "ভাই নিতাই, আমার কাছে তোমার নিজের পরিচয় না দিয়া সোণদাসী বলিয়া এত দিন এরূপে রহিলে কেন?"

নিত্যানন্দ বলিলেন "তুমি যেমন সনাতন, আমিও তেমনি সোণাদাসী। তুমি সনাতন কেন ?" এরূপে তাঁহাদের মধ্যে রসিকতা হইল, পরস্পর প্রেমালাপে আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। এই পরিচয়ও মিলনের পর. সাধারণে ইহা ব্যক্ত হওয়ার পূর্ব্বেই, সেখানে আর দুই দেহ রহিল না॥ নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের অঙ্গে মিশিয়া গেলেন. এই সব খবর সাধারণে কই পাইল না।

প্রশ্ন = প্রভু তার পর কি করিলেন ?

উত্তর = তিনি যে লোভে এখানে বাদসার চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিয়া বাস করিতেছিলেন—দেখিলেন, ততদূর এখানে কিছু হইবার নয়. তাই আকবর বাদসার বাড়ীও ছাড়িলেন।

প্রশ্ন = পরে কোথায় গেলেন ?

উত্তর = এর পরের অনেক ঘটনা, শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের প্রকাশিত সাধু সঙ্গীতে ৺নব কিশোর গুপ্ত মহাশয়ের ধর্ম্ম জীবনী খণ্ডে লিখিত আছে.—তাহা দেখিলেই জানিতে পারিবেন। তবে মোটের উপর কথাটী এখানে বলিয়া ফেলি। তার পর ভিখারী ফকির বেশে নানা স্থানে ঘুরিয়া নানা স্থানে নানা অলৌকিক দৃশ্য দেখাইয়া ঘোষ পাড়া গিয়া তাঁহার নিত্য সঙ্গীগণকে প্রকাশ করিয়া হাট বসালেন। তাহারই নাম পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি, —"বাইশ ফকিরের হাট"। তৎসময়ের একটী গান বলিতেছি শুনুন :—

গীত।

"এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এল।
এর নাহিক রোষ সদাই তোষ মুখে বলে সত্য বল ॥
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটী মন,
জয় কর্ত্তা বলি, বাহু তুলি কল্লে প্রেমে ঢলাঢল।
এযে হারা—দেওয়ায়, মরা বাঁচায় এর হুকুমে গঙ্গা শুকাল ॥"

এই গানটী ৺ অক্ষয়কুমার দত্তের প্রণীত বহিতে প্রকাশ আছে।

ঘোষপাড়ায় এই ফকির ঠাকুরের বিষয় পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের লিখাতে অনেক আছে। ইহা সব বলিতে গেলে বিস্তারিত প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কথিত ৺ নবকিশোর গুপ্ত মহাশয়ের ধর্ম্ম জীবনী বহিখানা দেখিলেই সে সব জানিতে পারিবেন, তবে ফকির ঠাকুরের দেহ রাখা বিষয়টী সেই বহিতে নাই, তাহাই মাত্র বলিতেছি। ফকির ঠাকুর ঘোষপাড়ায় ৺রামশরণ পাল মহাশয়ের বাড়ীতেই থাকিতেন। দেহ ছাড়ার পূর্ব্বেই রামশরণ পালের বাড়ী হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেও রামশরণ পালের সঙ্গে নিত্য সংস্রব ছিল। রামশরণ পাল বাইশ ফকিরের একজন। আমরা কেবলমাত্র জানি ঘোষপাড়ার বাইশ ফকিরের পূর্ণ হাটে তিনি দেহ ছাড়িয়া ছিলেন। ঘোষপাড়া গ্রামে না অন্য কোন গ্রামে তাহা ঠিক করিয়া কোন সাধুজন মুখে শুনি নাই। এরূপ কোন প্রশ্নও আমাদের মনে হয় নাই। তবে ৺অক্ষয়কুমার দত্ত এক গ্রামের নাম লিখিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। যাক্ যাহা বলিতে মনে হইয়াছে তাই বলি ঃ—

ফকিরঠাকুর দেহ ছাড়িলেন পর ৺রামশরণ পাল প্রভৃতি একদল সেই দেহ অগ্নিতে সৎকার করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। ভক্তগণ মধ্যে আর একদল এ দেহ মৃত্তিকাপুত করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। ইহাতে এই দুই দলে এই বিষয়ে তর্ক বাজিয়া উঠিল। কিছুই মীমাংসা হয় না। এ তর্কে অনেক সময় চলিয়া গেলে পর ফকির ঠাকুর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন যে, ছি! ছি! তোদের কি এখনও চাম পোকায় ছাড়ে নাই, চামড়া লইয়া টানাটানি করিস্! এইটে যা ইচ্ছা তা হক্ না কেন—তাতে কি? দেহ ছাড়া হইতেছে বলিয়া তোমাদের ত ছাড়িয়া যাইতেছি না। রামশরণ পালকে বলিলেন—"রামশরণ, তুমি এই ঝগড়া বাদ দেও—নেও তুমি আমার এই কাঁথা খানা। দেহটা তারাই নিয়ে যাক্, তুমি আপত্য করিও না। আমাকে লোকে মুসলমানী নামেই ফকির ফকির ডাকে। এই দেহ মৃত্তিকাপুত হওয়াই সঙ্গত।" ইহাতে আর কাহারই এ বিষয়ে কোন কথা রহিল না। ফকির ঠাকুর নিজে এই মীমাংসা করিয়া দেহ ছাড়িয়া দিলেন। দেহ মৃত্তিকা-পুত করা হইল। রামশরণ পাল কাঁথা খানা নিয়া বাড়িতে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। পাল মহাশয়ের দেহ রাখার পর, পাল মহাশয়ের স্ত্রী—শচী ঐ কাঁথার মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিলেন। তাহাই পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। প্রভু গোপীনাথ মন্দির হইতে লুকানর পর এইত এই সব কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা আর কত বলিব। নিত্যসঙ্গীগণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

নিত্যলীলা

নিত্যই বর্ত্তমান।

প্রশ্ন = আপনি যে বলিলেন—ফকির ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এদেহ ছাড়া হইতেছে, তোমাদের ত ছাড়িয়া যাইতেছি না। যদি দেহ ছাড়িলেন, তবে রহিলেন কি প্রকারে ?

উত্তর = ইহা জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা বুঝিবার নহে। চৈতন্য কৃপায় যাঁহারা স্বচৈতন্য, যাঁহাদের সে চক্ষু ফুটেছে, তাঁহারা চক্ষে দেখিয়া অভ্রান্ত স্থির ভাবে তাঁহাকে ধরিয়া আছেন; তাঁহাদের এরূপ প্রশ্নই অন্তরে নাই। এ বুঝাইয়া শিখাইবার বিষয় নহে। ভক্ত সমাজ তাঁহার বাসস্থান, তিনি নিজেই তৈয়ার করিয়া জীর্ণদেহ ছাড়িয়া নূতন দেহে যান। এই রূপে দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে থাকিতেই তিনি বলিয়াছিলেন—"এ দেহ ছাড়িতেছি, তোমাদের ত ছাড়িয়া যাইতেছিনা।"

এই অঙ্গ গোপনে কি জানি হারায়, এবং নূতন দেহ পরিচয় করিতে কি জানি গোল হয়, তাই কোন কোন অপরিপক্ক পাত্র এ বিষয় অন্তরের কথা তখন ও জানাইয়া ছিলেন। যাঁহাদের এই প্রশ্ন ছিল, তাঁদের বলিয়াছিলেন "তোমরা কখনও হারাইবে না, এদেহ ছাড়িলে ও আমি থাকিব, নূতন দেহ পরিচয়ের জন্যও তোমাদের ভাবনার বিষয় নহে। যাদের সঙ্গে আমার বর্ত্তমান সংযোগ হইয়াছে, নিশ্চয় জানিও তাদের মাথা অন্য কারো কাছে নত হইবে না। যে দেহেতে আমি থাকিব দেখিবে, তাহার মুখের কথায়

তোমাদের সকলের অন্তর সর্ব্বদা সুখী হইবে, আর আপনা হইতেই তোমাদের মাথা সেখানে বিকাইয়া যাইবে। যার কথায় তোমাদের সকলের অন্তর সুখী হইবে, সেখানেই জানিবে আমি আছি" এই কথাতে যে যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লইলেন। এ বিষয় অন্য কিছু বলিবার নাই। ইহাতেই যে যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লউন।

এই সত্য সনাতন নিত্য বর্ত্তমান ধর্ম্ম শ্রোত কিরূপ গতিতে প্রবাহিত হইয়া কাচ্‌ড়াপাড়া দিয়া কলিকাতায় আসিয়া ছিল, তাহা ৺নব কিশোর গুপ্ত মহাশয়ের ধর্ম্ম জীবনীতে শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। এভাবের কিছু জানিবার হইলে সেই বহিতে যতদূর হয় দেখিতে পাইবেন। ইঁহারা কখনই প্রভু হারা হন না বলিয়াই চিরকাল ইহা প্রভুর নিজ ধর্ম্ম। চিরকাল প্রভু স্বয়ং ইহার দাতা। চিরকাল প্রভুর ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

"অদ্যাবধি নিত্য লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

সতের দোহাই দিয়া
কাল্পনিক ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম নহে।

প্রশ্ন=আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, ঘোষ পাড়ায় রামশরণ পালের স্ত্রী—শচী কি এই ফকির ঠাকুরের ধর্ম্ম সংযোগে ছিলেন না?

উত্তর=হাঁ, ছিলেন।

প্রশ্ন=তবে শচী হইতে প্রচারিত কর্ত্তাভজা ধর্ম্মকে আপনি সত্য সনাতন ধর্ম্ম বলেন না কেন?

উত্তর—এই শচীকেই উপলক্ষ করিয়া ফকির ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন "কলা গাছে সার হয় না" শচী মাকে ধরিয়া উদ্ভূত কর্ত্তা ভজা নামধারী ধর্ম্মকে সত্য সনাতন ধর্ম্ম বলা হয় না কেন বলিতেছি, এখন শুনুন। স্থির চিত্তে মনোযোগ সহকারে শুনিবেন। কথাটী একটী উপমা সহকারে বুঝাইয়া বলিতেছি। ইহা হইতে যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লইবেন। যাঁহাদের গুরুদত্ত চক্ষু ফুটিয়াছে, তাঁহারা কথার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটী প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। বৃক্ষের যেমন মূলশাখা, উপশাখা, ও পরগাছা আছে, সত্য সনাতন বৃক্ষেরও একটী মূল শাখা, আর উপশাখাও আছে। উপশাখার চামড়ার রসে পরগাছা ও জন্মায়, মূলশাখা মূলের সহিত নিত্য অভেদ সরল সংযোগে থাকিয়া নিত্য কালের সঙ্গে সঙ্গেই সম ভাবে সর্ব্বকালে বর্ত্তমান আছে। ইহার আর শেষ— অবধি নাই। তাহাতে সাধুগণ বলিয়া থাকেন ঃ—

"চৈতন্য লীলার কভূ অবধি না হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয়॥"

মূল শাখা হইতে যে যতটুকু রস লইয়া উপশাখা বহির্গত হয়, উপশাখার গতি ততদূর পর্য্যন্ত। ইহা হইতে বেশী আর চলিতে পারে না। মূল শাখার অপরিসীম গতি দেখিয়া লোভে কোন কোন উপশাখা নিজ চামড়ার রসেও পরগাছাও জন্মায়, তাহাতে কেবল জঙ্গলই বাড়ে।

সত্য সনাতন ধর্ম্ম।

আচ্ছা, আপনিত জিজ্ঞাসা করিলেন—শচীর প্রচারীত কর্ত্তাভজা ধর্ম্মকে সত্য শনাতন ধর্ম্ম বলিনা কেন? আপনি বলুন ত—এই যে আপনার বাড়ীতে সুমিষ্ট ফল যুক্ত আম্র বৃক্ষটী দেখা যাইতেছে. ইহার উপশাখায় যে ভিন্ন রকমের কতকগুলি আগাছা জঙ্গল দেখিতেছেন, ইহাকে আপনি আম গাছ না বলিয়া পরগাছা বলেন কেন? কারণ আপনি আমগাছও চিনেন, পর গাছাও চিনেন, তাহাতেই পরগাছাকে—পরগাছা বলিতেছেন। ইহারাও এই রকম কর্ত্তাভজা রূপ পরগাছাকে সুফল সত্য সনাতন ধর্ম্ম বৃক্ষের কোন ও অংশ বলিয়া বলেন না। ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন বীজে জন্ম. আগাছা জঙ্গলই বলে। কেবল কর্ত্তাভজা দলেই সত্যের দোহাই দেন, তাহা নহে। যার যার মনোমত ভাবে ধর্ম্ম করিলেও সকলেই সত্যের দোহাই দিয়া থাকেন। এরা যেমন শচীমার ধর্ম্ম বলিয়া ফকির ঠাকুরের দোহাই দেন, কেহ কেহ শ্রীরূপের ধর্ম্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া থাকেন। কেহ বলেন—আমি নিত্যানন্দ পরিবার, কেহ বলেন আমি অদ্বৈত পরিবার ইত্যাদি কতই হইতেছে। তাহাত পূর্ব্বেও বলিয়াছি। বর্ত্তমান সত্য যেখানে নাই, তাহা সত্য ধর্ম্ম নহে।

সত্য বর্ত্তমান।

প্রশ্ন=আপনি যে বর্ত্তমান সত্য--বর্ত্তমান সত্য বলেন, বর্ত্তমান সত্য কোথায় ?

উত্তর=যাঁহার আশ্রিত হইলে শাক্তের আনন্দময়ী শক্তি, শৈবের সদানন্দশিব, শৌরের ব্রহ্মানন্দ জ্যোতির্ম্ময়--সত্য, নিত্য সূর্য্য, গাণপত্যের সর্ব্বগণপতি গনেশ, বৈষ্ণবের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণ বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ লাভ হয়; সত্য অগতি হইয়া আশ্রিত ভাবে অকাপট ভক্তি সহকারে যাঁহার বাক্যে কান দিলে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া ভক্তকে ক্রোড়ে লইয়া ষটচক্র ভেদ ক্রমে মুহূর্ত্ত মধ্যে অনায়াসে নিত্য ধামে পঁহুছাইয়া দেন; যে সত্য-মানুষের কৃপালাভে ভক্তের ব্রহ্মলোক, শিবলোক, তারা ধাম, গোলক ধাম ইত্যাদি সমস্ত নিত্য ধাম যাতায়তের পথ অনায়াস সিদ্ধ হওতঃ মনের ভ্রান্তি জনিত তীর্থ ব্রত পরিশ্রম দূর হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়; সকল ধর্ম্ম সকল তীর্থ যাঁহার পাদপদ্মে সত্য বিরাজমান, সেখানেই সত্য বর্ত্তমান। যাঁহার কৃপালাভে সত্য কি, বা সত্য কোথায় বলিয়া কোন প্রশ্ন বা খুঁজিবার আর কিছু থাকেনা, বর্ত্তমান লাভে পরমানন্দে প্রাণের সব আশা মিটিয়া যায় কিছুই অপূর্ণ থাকেনা, সেখানেই সত্য বর্ত্তমান। শুধু মুখের কথায় এই সত্যের খবর পাওয়া যাইবে না। যে দিন সত্যের জন্য প্রাণ পিপাসিত হইয়া মিথ্যা কিছুতে আর রুচি থাকিবেনা;

আপনার বলে খুঁজিতে খুঁজিতে অপারগ হয়ত যে দিন অনুপায় হইয়া সত্য মানুষ ধনীর খুঁজ সত্য সত্যই অন্তরে হইবে, যেখানে সেখানে থাকুক, সে দিন তাঁহারই আকর্ষণে, তাঁহারই নিকট উপস্থিত হওত তাঁহার বাক্য অনুসরণ করিয়া সত্য অগতি হইয়া জ্ঞান বুদ্ধি জলাঞ্জলী দিয়া তাঁহারই পায় পতিত হইবে। সে দিন অগতির গতি, দয়াল প্রভু পতিত পাবন, স্বয়ং টানিয়া এই ভবকুপ হইতে তুলিয়া লইয়া স্বরূপ প্রকাশ করতঃ সত্য পরিচয় দিয়া সব ভ্রান্তি ঘুচাইয়া দিবেন, আর কিছুতেই এইঁ খবর লইতে পারিবে না। এ সত্য অন্তর না হইলে কানে শুনিলেও বুঝিবে না, চক্ষের সামনে ধরিলেও দেখিবে না।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি বাহির দর্শণের চাক্ চিক্য দেখিয়া সত্যের অপিপাসায় বহির্ম্মুখ জীবগণ বাহিরই নিতে লাগিল বলিয়া প্রভু তাহা ছাড়িয়াছেন। তখনই বলিয়াছেন, আর বহির্জাক জমক লইয়া এই কলির জীবের সম্মুখীন হইব না। ভবের নগন্য স্থানে সব টলা পাতিল্ বেড়িয়া নিজ স্বজন সহ থাকিব। যাহার প্রয়োজন হইবে, সে ইহা হইতেইঁ বাহির করিয়া লইবে। কলির শাসনে পীড়িত হইয়া যে কেহ সত্যের পিপাসিত হইবে, ঐ পিপাসায়ই তাহাকে অভিমান শূন্য করিয়া তুলিবে, তাহাতেই বহির্দর্শন ভুলিয়া গিয়া কাতর প্রাণে সত্য সুধা পানে উন্মত্ত হইয়া কাছে আসিবে।

তাহাতেই যে স্থান জগতের নগণ্য, যে সমাজ জগতে গ্রাহ্য করেনা, জাতিতে হীন, বিদ্যাতে হীন, বুদ্ধিতে ক্ষীণ, ভালরূপ কথা কহিবার শক্তিও সে সমাজের নাই, ঐহিক ধনে, রূপে, গুণে যাঁহারা ভবে নিতান্ত

অগ্রাহ্য, তাদের লইয়া প্রভু এ জগতে বিচরণ করিতেছেন। যদি কেহ সত্যের পিপাসিত থাকেন, সত্য কোথায় জানিয়া লইতে সত্যই প্রাণের ইচ্ছা যদি কাহারও জাগিয়া থাকে তবে তিনি জাতি, কুল, মান ছাড়িয়া সকল প্রকার আত্ম অভিমান ত্যাগ করতঃ স্থির হয়ে কান পেতে ঐ শুনুন কোথা হইতে পরমানন্দ ধ্বনি সহকারে গান শুনা যাইতেছে ঃ—

রাগিণী মিশ্র—তাল খেম্‌টা।

"ভাব নগরে ভাবের বেনে, কচ্চে বদল বেচা কিনে।
দেহের বদল নিত্য দেহ তার, মনের বদল মনের মতন, নাহিক অন্সুসার ;
তাই বল্‌তে বল্‌তে, চল্‌তে চল্‌তে, ডাকচেরে আয় কে কোন খানে॥
তার লেনা দেনার কেনার আখেরি,
বেচবে এবার, রাখবেনা ধার নগদ বিক্রী ;
সে ঋণের দায়ে মানের ভয়ে সকল দিয়ে ঠেকে জানে॥
বর্ত্তমান সত্য কোথায়, কথায় আমি আর কি বলিব।"

যে সত্য সত্য—ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে সর্ব্বকারণের কারণ, অনন্ত জগতের কর্ত্তা, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বর্ত্তমান স্বরূপ বাক্যে ভক্তগণকে সৎ-চিদানন্দ ময় রসে ভাসাইয়া দিতেছেন, সেখানে সত্য সনাতন ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

যে সত্য সত্য—ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে পরমাত্মা পরম পুরুষ, সত্য চৈতন্য আনন্দে প্রত্যক্ষ রূপে সপ্রকাশ থাকিয়া আত্মতত্ত্ব বিহীন পরমতত্ত্ব পিপাসিত জীবগণের প্রতি কৃপা ঈক্ষণ দ্বারা স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়া পরমতত্ত্ব শ্রীরূপে মিশাইয়া পরমানন্দ রসে ভাসাইয়া দিতেছেন, সেখানে জানিবে—সত্য সনাতন ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

সত্য সনাতন ধর্ম্ম।

যে সত্য সত্য—ধর্ম্ম মণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু বর্ত্তমান থাকিয়া নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভু সহ নিত্যানন্দ পরিকর, অদ্বৈত পরি-করকে আপন অঙ্গে মিশাইয়া লইয়া পরস্পর প্রেম সুধা আস্বাদনে আনন্দের হাট বসাইয়াছেন, সেই খানেই—সত্য সনাতন ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

যে সত্য সত্য—ধর্ম্ম মণ্ডলীতে খোদ খোদা বর্ত্তমান থাকিয়া, হু নবিদ্বারা আদমকে সজিদা দিতে নারাজ মকরম কর্ত্তৃক প্রতারিত জীবগণকে আদম মানিবার প্রকৃত প্রবৃত্তি জন্মাইয়া, হুকুম মানাইয়া হুত নবিদ্বারা খোদ খোদার কাছে বর্ত্তমানে টানিয়া লইতেছেন, সেখানে জানিবে—সত্য সনাতন ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

যে সত্য সত্য—ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে পরম পিতা পরমেশ্বর বর্ত্তমান থাকিয়া, পুত্র—ঈশ্বর ত্রাণকর্ত্তা সত্য মানুষ যিশুখৃষ্ট স্বরূপে সম্মুখীন হইয়া, জ্যোতির্ম্ময় উপদেশ দানে জগতের পাপী পতিত সত্যাকৃষ্ট জীব-গণের পাপ গ্রহণ করিয়া পবিত্র করতঃ স্বয়ং ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া পরমানন্দ সুধায় ডুবাইয়া দিতেছেন, সেখানে জানিবে—সত্য সনাতন ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

যাঁহার অপার অনন্ত মহিমা অনন্তদেব অনন্ত মুখে বর্ণন করিতে অসমর্থ, আমি ক্ষুদ্র জীব তাঁহার মহিমা এক মুখে কি বর্ণনা করিব ? মোটের উপর এই মাত্র বলিতেছি—সত্য সনাতনের হাটে আন্দাজি কোন কারবার নাই, সব বর্ত্তমান। যেখানে সব বর্ত্তমান, সেখানেই —সত্য সনাতন ধর্ম্ম।

সাধু শাস্ত্রে, সাধু বাক্যে, যাহা শুন, তাহা যেখানে সব বর্ত্তমান,—

প্রত্যক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেখানে জানিবে—সত্য সনাতন ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

ইহার আশ্রিত হইলে ভূত, ভবিষ্যৎ ভাবনা ভুলিয়া গিয়া বর্ত্তমান স্বরূপেই প্রাণ মিশিয়া গিয়া পরমানন্দে থাকিবে, সেই খানেই—সত্য সনাতন ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

এখন থাক্—

অনন্তের খেলা মুখে আর কত বলা যাইবে। বাহ্য বিষয়ক প্রশ্নে
যতটুকু কথা হওয়ার হইয়াছে। ইহার মধ্যে আরো বিষয়
আছে, তাহা তত্ত্ব বিষয় ও তত্ত্বাতীত বিষয়। এ সব বাহ্য
প্রশ্নের উত্তরের ভিতরে ও ইহার কতক কথা যে
না হইয়াছে তাহা নহে, সে সব বিষয় সাধারণ
চক্ষে দখিবার শুনিবার নয়। গুরু কৃপায়
সেই সব প্রশ্ন উঠিবার অবস্থা ও
সময় হইলে সব কথাই
অবশ্য হইবে।

এখন এই পর্য্যন্তই

সমাপ্ত।